সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক

আস্সালামু আলাইকুম। দিন, মাস ও বছরের হিসেবে আমাদের আয়ু ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অর্থা আমাদের কাজের সময় কমে আসছে। কিন্তু আমরা কী কাজ করছি? মুসলিম হিসেবে আমাদের দিন-রাত্রি কি ঠিকভাবে কাটছে? উম্মত হিসেবে আমাদের জীবনযাপন রাসূল (স:)-এর জীবনযাপনেরসাথে কতটা মিলছে? আমাদের নামাজ, আমাদের রোজা ,আমাদের হজ্ব কতটা জীবন্ত , কতটা প্রাণবন্ত ? একান্তে ভাবলে কিংবা আত্ম সমালোচনায় মগ্ন হলে যে কারো মনে এই প্রশ্নগুলো জাগতে পারে। এইসব প্রশ্ন যদি আমাদের সচেতন করে, কর্তব্যপরায়ণ করে এবং জবাবদিহীতার চেতনা জাগ্রত করে মনে, তা হলে আমাদের জীবন কাঙ্ক্ষিত মানে সমৃদ্ধ হতে পারে। শুধু জীবন নয়, মানসমৃদ্ধ জীবনই তো আমাদের কাম্য।

প্রিয় পাঠক, এ মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী একত্রিত হবেন পবিত্র মক্কায় । উদ্দেশ্য হজ্ব পালন। সাদা-কালো , অঞ্চল ও ভাষা নির্বিশেষ েসব হাজী এখানে এক আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকবেন। হজ্বে মুসলিম উম্মাহ যে তালবিয়া উচ্চারণ করেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। তালবিয়ায় বলা হয়, “হাজির হয়েছি হে আল্লাহ ! তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির হয়েছি। আমি হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাজি্র নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও । তোমার কোনো শরীক নেই। ” কিন্তু তালবিয়ায় আমরা যা উচ্চারণ করি, বাস্তব জীবনে তার কতটা অনুসরণ করি? হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো আরাফাত ময়দানে অবস্থান । জোহরের সময় ইমাম সাহেব এখানে খু বা দেন। এই খুতবায় থাকে মুসলিম উম্মাহর জন্য পথনির্দেশিকা । কিন্তু এই পথনির্দেশিকা সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। এবারও বর্তমান সময় এবং বিশ্বপরিস্থিতিকে সামনে রেখে পেশ করা হবে গুরুত্বপূর্ণ খুতবা। কিন্তু এই খুতবার মর্ম আমরা কতটা উপলব্ধি করবো , কতটা চর্চা করবো সেটাই হবে দেখার বিষয়। পরিশেষে েসবাইকে জানাই ঈদুল আযহার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কুরআনের আলো

- কোরবানির পশুর রক্ত মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা, আল্লাহর কাছে পৌঁছে তাকওয়া বা অন্তরের সদিচ্ছা , আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা । - সূরা হজ্ব , আয়াত-৩৭

- হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করতে থাক এবং সেজদা করতে থাক, নিজ রবের ইবাদত করতে থাক আর নেক কাজ করতে থাক, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে। - সূরা হজ্ব , আয়াত-৭৭

- বলে দিন, আমার খাঁটি ঈমানদার বান্দাদেরকে , যেন তারা নামাযের পাবন্দী করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন না কোন ক্রয় -বিক্রয় থাকবে, আর না কোন বন্ধুত্ব । - সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৩১

হাদীসের বাণী

- আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন : "আল্লাহ অবশ্যই তার বান্দার প্রতি এ জন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রসংসা করে অথবা কো ন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে। " - মুসলিম

- আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত । নবী করিম (সা:) বলেন : মুসলমান সেই ব্যক্তি , যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি , যে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে। - বুখারী ও মুসলিম

- আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন : "দোযখকে লোভনীয় জিনিস দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে দু:খ-কষ্টের আড়ালে রাখা হয়েছে। - বুখারী ও মুসলিম

প্রিয় কবিতা

হজের পাঁচটি প্রার্থনা

আসাদ বিন হাফিজ

এক. চাইনা কোন জমিদারী

চাই না কোন জমিদারী- বাড়ি আলীশান
আল্লাহ তুমি আমায় এমন রিজিক কর দান।
কারো কাছে কোনদিনও হাত না পাততে হয়
অভাব যেন অনায়াসে করতে পারি জয়
শোকরগুজার বান্দা হয়ে দিন করি গুজরান।
গরীব দুঃখী এতীম শিশু বৃদ্ধা এবং নারী
খালি হাতে যায় না যেন ছেড়ে আমার বাড়ি
দীনের পথে সাধ্যমত করতে পারি দান।
আমার যারা পোষ্য এবং শিষ্য পরিজন
অনায়াসে মিটে যেন তাদের প্রয়োজন
প্রশান্তিতে তারা যেন রয় গো মহীয়ান।

দুই. এ বুক ভরে দাও

মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে পেরিয়ে তেপান্তর
প্রেমের টানে এলাম যখন ছুটে তোমার ঘর
বললে তুমি আজ যা খুশি আমার কাছে চাও
উজাড় করে ভরে দেবো তোমার সাধের নাও।
আমার মনে প্রেমের তুফান চাইবো কি আর বলো
তোমার প্রেমের টানে আমার হৃদয় টলোমলো ।
চাইতে হলে তোমাকে চাই- আপন করে নাও
তোমার প্রেমের নজর অধম বান্দারে আজ দাও।
আশেক আমি তোমার প্রেমের তাই যেন পাই খুঁজি
এ প্রেম যেন দুই জাহানে হয় গো আমার পুঁজি
সাক্ষী থাকুক কাবার গিলাফ মাকাম ইব্রাহীম
তোমার প্রেমের টানে চাই গো সীরাত মুস্তাকিম ।
জীবন নদী বয় যেন গো তুমি যেমন চাও
তোমার প্রেমের অতুল সুধায় এ বুক ভরে দাও।

তিন. চাই গো মাগফিরাত

তোমার নবীর রওজা আল্লাহ ছুঁয়েছে এ হাত
তার উসিলায় দিও গো প্রভু আখেরে নাজাত।
দেখেছি এ দুচোখ ভরে জান্নাতুল বাকী

উথলে উঠা আবেগ বলো কেমনে ঢেকে রাখি
তার উসিলায় দাও গো আল্লাহ বেহেশতি আবহায়াত।
দ্বীনের জন্য জীবন দিল কত শত প্রাণ
দাঁত হারিয়ে তোমার হাবীব হয়নি পেরেশান
সেই একীনের পরশ দিও আসলে আঁধার রাত।
পাপ করেছি ভুল করেছি রাব্বুল আলামীন
জগত জানে ছাড়িনি তো কভু তোমার দ্বীন
তার উসিলায় চাই গো খোদা তোমার মাগফেরাত।
চার. মাফ করে দাও
তোমার নবীর পথের ধূলো মেখেছি এ গায়
তার উসিলায় বান্দা তোমার নাজাত পেতে চায়।
তোমার হাবীব আমার প্রিয়
সেই উসিলায় নাজাত দিও
তুমি যদি না করো মাফ হবো নিরূপায়।
জমজমের অই পানি দিয়ে গোসল করেছি
তার উসিলায় তোমার কাছে নাজাত চেয়েছি।
ছুঁয়েছি যে কাবার গেলাফ
সেই উসিলায় কর গো মাফ
তুমি যদি না করো মাফ কোথায় যাবো হায়।
তোমার ঘরের চারধারে যে তাওয়াফ করেছি
সাফা মারওয়া বেকারারে সাঈ করেছি
হেঁটেছি যে আরাফাতে
মুজদালিফায় ছিলাম রাতে
মাফ করে দাও আমায় খোদ তার সে উসিলায়।
পাঁচ. তোমার দয়ার কুলকিনারা নাই
আমার কি আর সাধ্য ছিল নবীর দেশে যাই
তোমার নবীর আদরমাখা মাটির পরশ পাই।
হে দয়াময় সবই তোমার শান
ধন্য আমি পেয়ে তোমার দান
তাইতো আমি দিন-রজনী তোমারই গান গাই।
নবীর পথে নিলে যদি রহমতে অপার
পাপের পথে যাই না যেন এ অভাগা আর
সেই ক্ষমতা শক্তিটুকু তোমার কাছে চাই।
মরণ যেন হয়গো খোদা আঁকড়ে নবীর পথ
জীবনটা ভর ঘিরে থাকুক তোমার রহমত
জানি খোদা তোমার দয়ার কুলকিনারা নাই।

চিন্তাধারা

কুরবানী: প্রেমের মহিমায় ভাস্বর

কে. এম. শফিউল ইসলাম

মানুষ সৃষ্টির সাথে প্রভুপ্রেম জড়িত। মানুষ তার প্রভুর দাসত্ব ও শ্রদ্ধা -ভক্তিপূর্ণ জীবন গড়তে থাকবে বদ্ধপরিকর , তৎপর। প্রভুপ্রেমের নিদর্শন থাকবে তার প্রতিটি কাজে। জীবনের প্রতিটি শাখায়। যেসব কাজে প্রভুপ্রেমের নিদর্শন ফুটে ওঠে না সে সব কাজ হয় প্রাণহীন , শুষ্ক । সুতরাং যদি মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে নিষ্কলুস প্রভুপ্রেমের প্রকাশ ঘটে তবেই কেবল জীবন হয় পূর্ণময় । আল কুরআনুল কারীমের ঘোষণায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের কাজ হবে প্রভুর নিবেদনে। বলা হচ্ছে - "আমি মানব আর জিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য "। এই ঘোষণা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে হৃদয়ের প্রতিটি বাঁকে এই ঘোষ ণার বাস্তবায়ন রয়েছে সে হৃদয় হল প্রভু বিচরণের ঠিকানা।

মানুষের আচরণে কর্মে বা ইবাদতে যখন প্রভুপ্রেমের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন তা কেবল মালিকের দরবারে গৃহীতই হয় না বরং সেই কর্মে নিহিত প্রেমের প্রতিবিম্ব আসন্ন মানুষের মাঝে জিইয়ে রাখতে তবে পরিপূর্ণ সংরক্ষণ করেন। যার প্রমাণে আজো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে নিটল সেই সাফা-মারওয়া, মিনা আর বায়তুল্লাহ । ইব্রাহিম আর ইসমাঈল আ. পিতা-পুত্রে দু'জনে মিলে প্রভুপ্রেমে মগ্ন হয়ে সেই কাজ করেছিলেন, নিষ্কলুস প্রেমের সেই কীর্তি আগত জাতির জন্য মহান মালিক তা আজও অক্ষুন্ন রেখেছেন এমনকি বিদ্যমান জাতির জন্য তার যিয়ারত করা অপরিহার্য । তারই ধারাবাহিকতায় প্রভুপ্রেমে রত হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করাও একটা প্রেম নিবেদনের মাধ্যম । যাকে ইসলামি পরিভাষায় কুরবানি বলে।

কুরবানির অর্থ ও ইতিহাস

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারো নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'কোরব ানবলা হয়। শরীয়াতের পরিভাষায় কোরবান ঐ জন্তুকে বলে যাকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যবেহ করা হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পশু যবেহ করার মাধ্যমে কুরবানি করার প্রথা মানব ইতিহাসের শুরুলগ্ন থেকেই চলে আসছে। পবিত্র

কুরআনে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ আছে, হযরত আদম আ.-এর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিল যখন একটি বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তখন সেই বিবাদের মিমাংসার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন যার কুরবানি কবুল হবে রায় তারই পক্ষে যাবে। হাবিল ভেড়া, দুম্বা , ইত্যাদি পশু পালন করত, সে একটি উ কৃষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। কাবিল কৃষিকাজ করত সে কিছু শস্য , গম ইত্যাদি কুরবানির জন্যে পেশ করল। অতপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মিভূত করে দিল। আর কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতা য় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশে ভাইকে বলে দিল অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তার ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ না দেখিয়ে একটি মার্জিত ও নীতিগত উত্তর দিল। যাতে ছিল কাবিলের সহাভূতি ও শুভেচ্ছা , সে বলল, আল্লাহ তায়ালার নিয়ম এই যে, তিনি খোদা ভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাভীতি আচরণ করলে তোমার কুরবানিও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

যুগে যুগে কুরবানি

কুরবানির ইতিহাস বড় দীর্ঘ । মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে এই কুরবানির প্রচলন । ইতিহাস ও তাফসিরের গ্রন্থগুলো থেকে বুঝা যায় আদম আ. এর পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিল থকে শুরু করে হযরত ইব্রাহিম আ. পর্যন্ত এই কুরবানির আমল জারি ছিল। হযরত ইব্রাহিম আ. আল্লাহর আদেশ পালনার্থে স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি দিতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সেই থেকে কুরবানির ফজিলত ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। এবং এটি আল্লাহ কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র আমলে রূপ নেয়। জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আ. কে অনুসরণ করে পরবর্তী জামানার সকল নবী-রাসূল এই কাজ অব্যাহত রাখেন। এমন কি জনাব রসূল কারীম সা. নিজে বিদায় হজ্বে একশত উট কুরবানি করেছিলেন। সাথে অসংখ্য সাহাবিরা এই কাজে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত , সাহাবারা রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে আল্লাহর রাসূল সা.! এই যে আমরা পশু যবেহ করে কুরবানি করি এর হাকিকত কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন এটি হল তোমাদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম আ. এর সুন্নত । সেই থেকে আজও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা এই কুরবানিকে নিষ্ঠার সাথে আদায় করে আসছে। প্রতি বছর জিলহাজ্ব মাসের দশ তারিখের এই কুরবানির মহো সব পরিলক্ষিত হয়।

মানব সমাজে কুরবানির প্রভাব

জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে আমাদের চতুর্পাশ লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি সমাজে কুরবানির গুরুত্ব ও প্রভাব কতটা বেশি। সেদিন আমরা দেখতে পাই প্রতিটি মুসলমান পিতার মাঝে ইব্রাহিমী প্রেম , ভক্তি আর যজবা। আর প্রতিটি পুত্রের মাঝে ইসমাঈলী ঈমানী দৃঢ়তা; ইসমাঈলী চেতনায় উজ্জিবিত সেই কুরবানি মানুষেরমাঝে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, পশু উৎসর্গকারী কোটি কোটি প্রেমিকদের মাঝে হিল্লোল বইতে থাকে। এরই প্রভাবে মানুষ রবকে নতুন করে খুঁজে ফেরে। উৎসর্গ ও ত্যাগের মহিমায় মানুষ নিজেকে প্রভুপ্রেমে বিলিন করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অলিতে গলিতে শুধু একটাই দৃশ্য , ত্যাগের দৃশ্য , উৎসর্গের দৃশ্য । লাল খুনে রঞ্জিত ভক্ত -প্রেমিকদের রক্তিম দৃশ্য ।

বাস্তব জীবনে কুরবানি

আল্লাহর হুকুম ইব্রাহিম আ.-এর সেই মহান কুরবানি থেকে শিক্ষা নিয়ে তা আমাদের বাস্তবজীবনে ফিট করতে হবে। নিজে সেই প্রেমের মহিমায় ভাস্বর হয়ে ত্যাগের জীবন গড়তে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে প্রতিটি খোদায়ী পরীক্ষার সম্মুখে । যুগে যুগে খোদায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের পূর্বসূরীরা নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আম্বিয়া , আউলিয়াগণ বিভিন্ন ধরনের কুরবানির ইতিহাস খাড়া করেছেন। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিভিন্ন কষ্ট -ক্লেশ , জ্বালা -নির্যাতন সহ্য করেছেন। কুফরি ও পরাশক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরণ লড়াই করেছেন। আমাদেরকেও তাদের সেই ইতিহাস অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে কুফরী মিল্লাতের সামনে জীবন কুরবানি করে যুদ্ধে ..... শক্তিতে নিটল থাকতে হবে। তবেই আমাদের জীবনে ইব্রাহিমী সেই কুরবানির পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরবানি

আজকের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আচার আর জাহেলি যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের আচারের মাঝে ক্রমশই দূরত্ব কমে আসছে। সেদিনের সমাজ ছিল কুসংস্কার , পাপাচার, অন্যায় -অনাচার। আজকের সমাজও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। কুক্ষিগত অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থা এখনকার সাধারণ মানুষের জীবন চলনে ব্যহতসৃষ্টি করছে। দুনিয়ার কোথাও নেই ছাড় দেওয়ার মনোভাব । নেই সৌজন্যতার স্বভাব । প্রতিহিংসার দাবানলে মানুষ জ্বলছে দিন-রাত। অর্থ ও ভোগ বিলাসের মোহ মানুষকে অন্ধ করে তুলেছে। অথচ কুরবানি এমন একটি বিষয় যাতে রয়েছে

উত্তম চরিত্র , উত্তম নিদর্শন ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের নীতিমালা ও উপাদানবলী। কুরবানি নিছক আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়, এতে রয়েছে অসংখ্য শিক্ষণীয় ও সংস্কারমূলক বিষয়। এতে নিহিত রয়েছে একটি সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ গঠনের অসংখ্যপথ নির্দেশ । হযরত হাজেরা আ. প্রাণের দুলাল দূরন্ত দুর্বার কিশোর ইসমাঈলকে চোখের সামনে পিপাসায় কাতর যায় যায় ওষ্ঠাগত প্রাণ দেখে তিনি নিজের জীবন বাজি রেখে সুউচ্চ দুর্গম পাহাড়ে ছুটে চলেছিলেন এক ফোঁটা পানির জন্য । আশি বছর জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত সেই প্রিয় পুত্রকে মহান প্রভুর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হযরত ইব্রাহিম আ. দ্বিধাহীন চিত্তে কুরবান করে দিতেও প্রস্তুত হলেন। আমরা যদি হযরত হাজেরা আ. এর মানব প্রেমের সেই অস্থিরতা আর ইব্রাহিম আ. এর প্রভুপ্রেমের সেই Øিগ্ধতা থেকে কিঞ্চিত শিক্ষা নিয়ে অতি সামান্য পরিমাণও মানব প্রেম ও মানব সেবায় নিজেকে ছাড় দিই তবেই একটি সুষ্ঠু সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্রগঠনে এর ভূমিকা অনেক। আর তা বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে দাবিদারও বটে।

কুরবানির দাবি ও গোস্তের বিধান

অস্তিত্বহীন মানব জাতিকে আল্লাহ তায়ালা জমিনের নির্যাত ও এক ফোঁটা নাপাক পানি দ্বারা সৃষ্টি করে যেই অনুগ্রহের নিদর্শন কায়েম করেছেন তা মানব জাতির জন্য কেবল আনন্দের বিষয় নয় বরং এটা তার অস্তিত্বের প্রমাণ । সুতরাং তার অস্তিত্বের নির্মাতার জন্য নিজের খবিস স্বভাবকে পদদলিত করে সেই মহান নির্মাতার জন্য একটি জীব কুরবানি একান্তই দাবি রাখে। এটা হবে নিজের পাশবিক নফসের কুরবানির স্বরূপ । এই পশু কুরবানি দিয়ে সে যেন নিজ সত্তার মাঝে নিহিত পশুকে কুরবানি করল। অতএব কুরবানির দাবি একান্ত সুদৃঢ় ও যুক্তি নির্ভর ।

কুরবানি যেমনভাবে নিজের পশুত্বকে দূর করার ভূমিকা রাখে তেমনি তার গোস্তও নিরন্ন , বিবস্ত্র , নগ্ন , অর্ধনগ্ন ও দুস্থ মানবতার সেবায় রাখতে পারে এক বিশেষ অবদান। ইসলাম বন্টনের নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। সেই ভিত্তিতে কুরবানির গোস্তের এক ভাগ গরীব অসহায়ের জন্য । যারা সারা বছর এক টুকরা গোস্ত খেতে পারেনা। সেই গোস্ত সুষ্ঠুভাবে বন্টনের মাধ্যমে পুনরায় ফিরে আসতে পারে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ , মমত্ববোধ , সৌহার্দ , সম্প্রীতি , সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিময় সুখী সমাজ। কারণ তারা একদিন হলেও গোস্ত দিয়ে দু'মুঠো ভাত খেয়ে ভুলে যেতে পারে সারা বছরের অসহনীয় দুখের গ্লানী ।

কুরবানির দিন ও কুরবানির বস্তু

ইব্রাহিমী সুন্নত এই মহান কুরবানি যে কোন দিনে করলে চলে না বরং এর জন্য রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট সময়, রয়েছে কুরবানি করার সময় মাত্র চার দিন। নহরের দিন এবং তৎপরবর্তী তাশরিকের তিন দিন। কেননা রাসূল সা. বলেছেন, "তাশরিকের দিন কুরবানির দিন"। কুরবানির দিন যেমন সুনির্দিষ্ট তেমনি কুরবানির বস্তুও সুনির্দিষ্ট । পূর্বেকার জামানায় ধান, গম ও জমির ফসল দ্বারা কুরবানি করা যেত কিন্তু এখন কেবল পশু ছাড়া অন্য কোন বস্তুদ্বারা কুরবানি করা যাবে না। তাও আবার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি পশুর মাঝে সীমাবদ্ধ । উট, গরু, দুম্বা , মহিষ, ভেড়া ও বকরি ছাড়া অন্য কোন প্রাণী দ্বারা কুরবানি বৈধ নয়। অতএব হাঁস, মুরগী, হরিণ, খরগোস ইত্যাদি দ্বারা কুরবানি সহিহ্ হবেনা।

ধন্যবাদ আলেম সমাজের ভূমিকা

কুরবানির দিনগুলোতে দূষণমুক্ত পরিবেশ দূরীকরণে আলেম সমাজকে ধন্যবাদ। ঈদের নামায পড়ে পাগড়ি মাথায় খঞ্জর হাতে যেভাবে তাঁরা মানব সেবায় ব্রতর হয় তা এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত । বিনে পয়সায় মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা যে খেদমত আঞ্জাম দেয় তা সত্যিকারেই প্রশংসার দাবিদার। নিজের জামা কাপড় রক্তে রঞ্জিত করে তারা যেভাবে অন্যের উপকার ও সাহায্যে এগিয়ে আসে তাতে কেবল সাম্য -মৈত্রীই প্রকাশ পায়না বরং উখওয়াত, ইনসানিয়্যাত ও মানুষ মানুষের জন্য এই দৃশ্য ফুটে ওঠে। আমাদের মত কুরবানি না জানা মানুষের জন্য যদি তারা সাহায্যের হাত প্রসারিত না করত তবে হয়ত আমাদের এই কাজ আঞ্জাম দিতে বেগ পেতেহত। পরিশেষে তারা চামড়া সরবরাহ করে এমন একটি ভূমিকা রাখে যা দুষণমুক্ত পরিবেশে জরুরি পদক্ষেপ বহন করে। তাই ধন্যবাদ তাদের এই নিঃশর্ত ভূমিকাকে।

কুরবানির আমল

উল্লেখিত আলোচনার পর আমরা সংক্ষেপে জেনে নিতে পারি ঈদের দিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল। কুরআন, হাদিস ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে অধিক হারে যে আমলগুলো দৃষ্টিগোচর হয় তা হল যথাক্রমে :

১. জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ ফজর থেকে তের তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবির বলা।

২. ঈদের দিন ঈদের সালাতের পর কুরবানি করা।

৩. পুরুষের জন্য গোসল করা ও সুগন্ধি মাখা। সুন্দর কাপড় পরিধান করা।

৪. সকাল থেকে কিছু না খেয়ে বরং কুরবানির গোস্ত দিয়ে খানা খাওয়া।

৫. সম্ভব হলে ঈদগাহে হেঁটে হেঁটে যাওয়া।

৬. ঈদের নামাজ পড়া এবং খুতবায় অংশগ্রহণ করা।

৭. এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরা।

৮. ঈদের দিন একে অন্যকে শুভেচ্ছা বিনিময় করা।

৯. ইহা ছাড়া ঈদুল আজহারপ্রথম দশ দিন খুবই ফজিলতপূর্ণ। তাই যথাসম্ভব সে দিনগুলোতে বেশি বেশি নফল ইবাদতে মশগুল থাকা।

কুরবানির ফজিলত

কুরবানির অধিক গুরুত্বের ন্যায় এর ফজিলতও সীমাহীন। কুরবানির ফজিলতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রিয় নবীজী সা. বলেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র হৃদয়ে সওয়াবের আশায় কুরবানি করবে তার কুরবানি তার এবং জাহান্নামের মাঝে এক প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। অপর এক হাদিসে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সা.-কে এই কুরবানির ফজিলত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "প্রতি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হবে।" আরেকটি হাদিসে আছে, "কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই কুরবানিকারী মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে নেয়।"

কুরবানির শিক্ষা

কুরবানি হতে হবে নিঃশর্ত। ভক্ষণ ও অহংকারমুক্ত। থাকবে কেবল ইখলাস ও তাকওয়া। হযরত ইব্রাহিম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. যেমন পরিষ্কার অন্তর নিয়ে মহান আল্লাহর হুকুম পালনে ব্রতী হয়েছিলেন আমাদেরকেও তেমনি হতে হবে। তখনই কেবল আমাদের কর্মে বাস্তবায়ন হবে আল্লাহর সেই কালিমায়ে, "বলো ! নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য , যিনি সকল সৃষ্টির রব।

নিবন্ধ

ক্বাবার পথের মেহমান

জাফর আহমাদ

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ । আরবী ভাষায় হজ্জ শব্দের অর্থ যিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু খানায়ে কাবা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা পৃথিবীর চারিদিক হতে নির্দিষ্ট কেন্দ্রের দিকে চলে আসে, তাই এর নাম হজ্জ রাখা হয়েছে। কিন্তু এ হজ্জের পেছনে এক সংগ্রামী , চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস নিহিত রয়েছে। যারা এ বিশ্ব সম্মেলন কেন্দ্রে আল্লাহর মেহমান হিসাবে হাজিরা দিতে যাবেন, তারা যদি একটু গভীর মনযোগ সহকারে সে ইতিহাস অধ্যয়ন করে নেন তবে হজ্জের প্রকৃত শিক্ষা ও কল্যাণ লাভ করা সহজ হবে।

হজ্জ এলেই আমাদের হৃদয়পটে ভেসে ওঠে শিরকের মুলোৎপাঠনকারী মুসলিম মিল্লাতের অবিসংবাদিত সংগ্রামী নেতা ও পিতা হযরত ইবরাহিম আঃ এর কথা। যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর সন্ধানে চন্দ্র , সূর্য , গ্রহ ও নক্ষত্রকে ব্যর্থ প্রভু ভেবে ভেবে অবশেষে সত্যের আলোর সন্ধান পেলেন এবং উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করলেন: “তোম রা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। ” তিনি আরো বললেন ”আমি সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নহি। ”

এ পুর্ণাঙ্গ মানুষটি যৌবনের শুরুতেই যখন আল্লাহকে চিনতে পারলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে বললেনঃ ইসলাম গ্রহণ কর-স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন কর, আমার দাসত্ব স্বীকার কর। তিনি উত্তরে পরিস্কার ভাষায় বললেন: আমি ইসলাম কবুল করলাম, আমি সারা জাহানের প্রভুর উদ্দেশ্ যে নিজেকে উ সর্গ করলাম, নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করলাম। তিনি রাব্বুল আলামীনের জন্য শত শত বছরের পৈতৃক ধর্ম এবং এর যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান ও আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। অথচ পৈতৃক মন্দিরের পৌরহিত্যের মহাসম্মানিত গদি

তার জন্য অপেক্ষা করছিল। যে গদিটিতে বসলে তিনি অনায়াসেই জাতির নেতা বনে যেতেন। চারদিক থেকে নযর-নিয়ায এসে জড় হত এবং জনগণ ভক্তি -শ্রদ্ধা ভরে মাথা নত ও হাত জোড় করে বসত। সাধারণ মানুষ হতে বাদশাহ পর্যন্ত সকলকে আজ্ঞানুবর্তী গোলাম বানিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু এ বিরাট স্বার্থের উপর পদাঘাত করে সত্যের জন্য দুনিয়া জোড়া বিপদের গর্ভে ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হলেন। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তা করতেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য রবের গোলামীর নাগপাশ হতে মুক্ত করে কিভাবে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যায়। অনেকগুলো কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার পর চুড়ান্ত ও শেষ কঠিন পরীক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহিম আঃ সবকিছু অপেক্ষা রাব্বুল আলামীনকেই বেশী ভালবাসেন কিনা, তার ফয়সালা হতে পারত না। তাই বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তার সন্তান লাভ হয়েছিল সে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা নেয়া হলো । পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। তখন চূড়ান্তরূপে ঘোষণা করা হলো যে, এখন তুমি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার দাবীকে সত্য বলে প্রমাণ করেছ। এক্ষণে তোমাকে সারা পৃথিবীর ইমাম বা নেতা বানানো যায়। আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে: “এবং যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সে সব পরীক্ষায় ঠিকভাবে উত্তীর্ণ হলেন তখন তাকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের ইমাম বা নেতা নিযুক্ত করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধরদের সম্পর্কে কি হুকুম? আল্লাহ তায়ালা বললেন যালেমদের জন্য আমার ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। ” (সুরা বাকারা-১২৪)

এভাবে হযরত ইবরাহিম আঃ কে দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করা হল এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম বা মুসলমানদের চিরস্থায়ী আদর্শিক নেতা নিযুক্ত করা হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাইল আঃ কে সাথে নিয়ে তিনি হিযাযের মক্কা নগরীকে কেন্দ্র করে আরবের কোণে কোণে ইসলামের শিক্ষাকে বিস্তার সাধন করলেন। আর পিতা পুত্র মিলে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র খানায়ে কাবা প্রতিষ্ঠা করেন। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দেন। খানায়ে কাবা সাধারণ মসজিদের ন্যায় নিছক ইবাদাতের স্থান নয়, প্রথম দিন হতেই এটা দ্বী ন ইসলামের বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রচার কেন্দ্ররূপে নির্ধারিত হয়েছিল। এ কাবা নির্মাণের মুল উদ্দেশ্য ছিল যে, পৃথিবীর দুরবর্তী অঞ্চলসমুহ হতে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী সকল মানুষ এখানে এসে মিলিত হবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আবার এখান থেকে

ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। বিশ্ব মুসলিমের এ সম্মেলনেরই নাম হজ্জ ।

এ ঘরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম আঃ এর দোওয়া শুনুন: আল কোরআনে আল্লাহ বলছেন "এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম দোয়া করেছিলেন ঃহে আল্লাহ ! এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানাও, আমাকে এবং আমার সন্তানকে মূর্তি পুজার শিরক হতে বাঁচাও। হে আল্লাহ ! এ মুর্তি গুলো অসংখ্য লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব,যে আমার পন্থা অনুসরণ করবে সে আমার, আর যে আমার পন্থার বিপরীতে চলবে-তখন তুমি নিশ্চয়ই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরওয়ারদিগার! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশ তোমার এ মহান ঘরের নিকট, এ ধুসর মরুভূমিতে এনে পুনর্বাসিত করেছি-এ উদ্দেশ্যে যে, তারা নামায কায়েম করবে। অতএব,হে আল্লাহ ! তুমি লোকদের মনে এতদুর উৎসাহ দাও যেন তারা এর দিকে দলে দলে চলে আসে এবং ফল-মুল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর। হয়ত ইহারা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হবে। " (সুরা ইবরাহীম-৩৫-৩৭)

এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আরো বলেন: "এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম: এ কথা বলে যে, এখানে কোন প্রকার শিরক করোনা এবং আমার ঘরকে তওয়াফকারী ও নামাযীদের জন্য পাক-সাফ করে রাখ। আর লোক দেরকে হজ্জ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানাও-তারা যেন তোমার নিকট আসে, পায়ে হেটে আসুক কিংবা দুরবর্তী স্থান হতে কৃশ উটের পিঠে চড়ে আসুক। এখানে এসে তারা যেন দেখতে পায় তাদের জন্য দ্বীন - দুনিয়ার কল্যাণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ঠ দিনগুলোতে আল্লাহর দেয়া জন্তু গুলোকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবে, তা হতে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে খেতে দেবে। " (সুরা হজ্জ -২৬-২৮)

এ ঘরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে পিতা পুত্র মিলে মহান আল্লাহর দরবারে আরো দোয়া করেছিলেন যা আল্লাহ নিজের ভাষায় কোরআনে বলেছেন: "এবং স্মরণ কর, ইবরাহিম ও ইসমাইল যখন এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন কালে দোওয়া করছিলেনঃ পরওয়ারদিগার! আমাদের এ চেষ্টা কবুল কর, তুমি সব কিছু জান এবং সবকিছু শুনতে পাও। পরওয়ারদিগার! তুমি আমাদের দুজনকেই মুসলিম-অর্থা তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশাবলী হতে এমন একটি জাতি তৈরী কর

যারা একান্তভাবে তোমারই অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদাত করার পন্থা বলে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। পরোয়ারদিগার ! তুমি সে জাতির প্রতি তাদের মধ্য হতে এমন একজন নবী পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার বাণী পড়ে শোনাবে ,তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দিবে এবং তাদের চরিত্র সংশোধন করবে। নিশ্চয় তুমি সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ । ” (সুরা বাকারা-১২৭-১২৯) যে শিরক উচ্ছেদ ও মূর্তি পূজা বন্ধ করার সাধনা ও আন্দোলনে হযরত ইবরাহীম আঃ ও ইসমাইল আঃ এর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন,

কালের বিবর্তনে এ কাবা ঘরেআবার ৩৬০টি মুর্তি স্থাপন করা হয়। চারদিকে শিরক আর শিরক চলতে থাকে। লাত, মানাত, হুবাল, নসর, ইয়াগুস, উজ্জা , আসাফ, নায়েলা আরো অসংখ্য নামের মূর্তি তৈরী করে পূজা করত। হজ্বকে তারা তীর্থযাত্রার অনুরূপ বানিয়ে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল কাবা ঘর হতে মূর্তি পূজার প্রচার শুরু করে ছিল এবং পূজারীদের সর্বপ্রকার কলা কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের নিকট হতে নযর-নিয়ায আদায় করত। হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোকে বিকৃতরূপ দিয়ে পালন করত। এ ভাবে ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসমাইল আঃ যে মহান কাজ শুরু করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে তারা হজ্জ -প্রথার প্রচলন করেছিলেন, তা সবই বিনষ্ট হয়ে যায়।

অবশেষে হযরত ইবরাহীম আঃ এর দোয়ারই ফসল মানবতার বন্ধু হযরত মোহাম্মদ সাঃ মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে শিরকের মূলো পাঠন করেন এবং মুসলিম মিল্লাতের পিতার হারানো হজ্জের নিদর্শন গুলো পূনরুদ্ধার করেন।
হজ্জের প্রতিট িপদে পদে আল্লাহর স্মরণ - আল্লাহর নামের যিকর, নামায, ইবাদাত ও কুরবানী এবং ক্বা 'বা ঘরের প্রদক্ষিণ । আর এখানে একটিমাত্র আওয়াযই মুখরিত হয়ে উঠে, হেরেম শরীফের প্রাচীর আর পাহাড়ের চড়াই উ রাইয়ের প্রতিটি পথে উচ্চারিত হয় : “লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লা শারিকা লাকালাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারিকা লাকা: অর্থা হে প্রভু তোমার ডাকে আমি উপস্থিত । আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই,আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার । তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই। ”

কাবার পথের যাত্রীরা কোথায় হাজিরা দিতে যাচ্ছেন আর হাজিরা দিতে গিয়ে কি বলছেন তা অবশ্যই গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করতে হবে। এমনিভাবে হজ্জের প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করার সময় কি করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে তা অনুধাবণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষেই কি আমরা আমাদের বাস্তব জীবনকে শিরকমুক্ত করতে পেরেছি এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে পুর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসাবে পেশ করতে পেরেছি? আত্মজিজ্ঞাসার জবাব যদি না বোধক হয়। তবে আমরা লাব্বায়িক বলে এ বিশ্বসম্মেলন কেন্দ্রে হাজিরা দিব ঠিকই কিন্তু আল্লাহর হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত লেখা হবে। যেমন প্রানহীন নামায মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতে পরছেনা, প্রাণহীন রোযা তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করতে পারছেনা ও যাকাত আমাদেরকে পবিত্র করতে পারছে না। তেমনিভাবে প্রাণহীন হজ্ব আল্লাহর হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতিই লেখা হবে। তাই কাবার পথের যাত্রীরা তাদের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করার জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন ।

শিরককে পরিত্যাগ করতে হবে ঃশিরক একটি জুলুম। শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। শিরক সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ“আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চিত শিরক হচ্ছে অতিবড় জুলুম। ” (লুকমান : ১৩) “নিশ্চয় জেনো শিরকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। এ ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে মাফ করে দেবেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো এক মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে। ” (নিসা ঃ৪৮) এ শিরক বর্তমানে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় এ শিরককে পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ শিরকমুক্ত জীবন ও সমাজ গঠন করার জন্যই হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত মুহাম্মদ সাঃ আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাছাড়া মহান আল্লাহর সম্মানিত মেহমান হিসাবে তালবিয়া পাঠে বলা হচ্ছে ”আমি উপস্থিত । আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমারই নিকটে এসেছি। তুমি একক-কেহই তোমার শরীক নাই। ” এ কথাটিকে বাস্তব জীবনে রূপায়ন করতে হবে।

দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে:-জন্মসূত্রে মুসলমান নয় বরং একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হবে, সারা জাহানের প্রভু র উদ্দেশ্যে নিজেকে উ সর্গ করতে হবে, নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজ কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। শুধু মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করা হলো কিন্তু জীবনের বিশাল অংশকে মানুষের তৈরী আদর্শের হাতে সোপর্দ করলে তিনি মুসলিম

নন বরং একজন খাঁটি মোনাফিক । প্রতি নামাযেই অসংখ্যবার বলা হচ্ছে : “আমরা তোমারই গোলামী করি আর তোমারই সাহায্য চাই”। অথচ নামাযের বাইরে তার বিপরীত কাজ করা হচ্ছে। এ এক মিথ্যাচার ছাড়া কি হতে পারে ? আর এ মিথ্যাচারকে বিশ্ব সম্মেলন কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াহয়। সেখানে গিয়ে বলা হয়ঃ হে প্রভু তোমার ডাকে আমি উপস্থিত । আমি এসেছি, তোমার কোন শরীক নাই,আমি তোমারই নিকটে এসেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমার জন্যে। সব নিয়ামত তোমারই দান, রাজত্ব আর প্রভুত্ব সবই তোমার । তুমি একক-কেউই তোমার শরীক নাই। ” অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীতকার্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের দ্বিমুখী নীতি বা মুনাফেকী আচরণ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাগ করতে হবে।

হজ্জ চেতনার অনুধাবন : হজ্জের অনুষ্ঠানগুলো ঐতিহাসিক চেতনাকে সামনে রেখে পালন করতে হবে। আর এ চেতনাকে হযরত ইবরাহীম আঃ ও হযরত ইসমাইল আঃ এর ন্যায় শিরকউচ্ছেদে এবং মানুষকে অসংখ্য মিথ্যা রবের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার আপোষহীন সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং এ সংগ্রাম নিজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই হজ্জের স্বার্থকতা ও সুফল পাওয়া যাবে এবং আল্লাহর হাজিরা খাতায় উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাবে।

লেখক : প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

চিন্তাধারা

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

শায়খ আবু ইউসুফ

সেদিন ছিল পহেলা অক্টোবর । চোখে -মুখে প্রচণ্ড আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়ে তড়িঘড়ি করে বিছানা ছাড়ল শিশু ইউসুফ। এ দিনটিতে দাদাকে অভিনন্দন না জানিয়ে দিনটিকে হারাতে চাচ্ছে না সে। দ্রুত দাত মেজে, হাত-মুখ ধুয়ে দৌড়ে চলে এলো দাদার রুমে। জাগিয়ে তুলে বলল, দাদু, এ দিনটিতে তোমাকে অসংখ্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। কি ব্যাপার দাদুভাই! আজ এতো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠিয়ে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে - ছোখ ছানাবড়া করে নাতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন দাদা আব্দুর রব সাহেব। ৯ বছরের এ ছোট শিশুটিকে দেখে বারবার চম কৃত আর বিস্মিত হন আব্দুর রব সাহেব। এ ছোট শিশুটিকে, তার সমবয়সী অন্য বাচ্চাদের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত মনে হয় আব্দুর রব সাহেবের। এ শিশুর মাঝে অন্যন্য প্রতিভা আর সম্ভাবনা খুঁজে পান তিনি। বাচ্চাটি একাধারে নতুন কিছু শেখার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী , প্রবল মেধাবী আর খুব মিষ্টি । মাশাআল্লাহ কোনো কিছুতেই যেন ওর কোনো কমতি নেই। সম্ভবত জানার আগ্রহ থেকেই সে সকাল সকাল দাদাকে উঠিয়ে অভিনন্দন জানায়।

শিশু ইউসুফ বলে, সে কি ব্যাপার দাদাভাই! তুমি জান না যে, আজ বিশ্ব প্রবীন দিবস। আমার স্কুলের ছেলেরা বলল, তারা সবাই আজ তাদের নানা-নানী, দাদা-দাদী, বয়স্ক সকলকে অভিনন্দন জানাবে, কার্ড , মেসেজ ইত্যাদি প্রদান করবে। এবার দাদাভাই গা ঝাড়া দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন।

দাদাভাইকে উঠে বসতে দেখে, ইউসুফ বলল, দাদাভই আমি কি তোম াকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? ইউসুফের অনুসন্ধি সু চোখ দেখে আব্দুর রব সাহেব হেসেই ফেললেন। আর ভাবলেন, এই বুদ্ধিদীপ্ত শিশুর মাথায় নিশ্চয়ই কোনো নতুন ভাবনার ঝড় চলছে। ‘বল দাদুভাই, কি প্রশ্ন তোমার ? ‘আচ্ছা দাদু, মানুষ কেন এ দিনটি উ যাপন করে? প্রবীন দিবসটি কি?

দাদাভাই বললেন, প্রতি বছর অক্টোবর মাসের এক তারিখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধ ও বয়স্ক মানুষদের প্রতি সচেতনতা তৈরীর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া এ দিবসে বৃদ্ধদেরকে উপহার, মেসেজ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। বস্তুত আধুনিক পাশ্চাত্য স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতারঅভিশাপে সমাজের বয়স্ক মানুষেরা অত্যন্ত অবহেলিত হন। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অধিকাংশ মানুষই বৃদ্ধ পিতামাতার তেমন খোজ খবর রাখেন না। একাকী বাড়িতে বা বৃদ্ধ নিবাসে তারা বসবাস করেন। পানাহার ও জাগতিক বিষয়গুলোর ব্যবস্থা থাকলেও পুত্র , কন্যা , পৌত্র , দৌহিত্র ও আপনজনের সাহচার্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। প্রবীন দিবসে তাদেরকে দয়া করে উপহার, মেসেজ ইত্যাদি দিয়ে থাকে তাদের দূরবাসী পুত্রকন্যা ও আপনজনেরা। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাবে আমাদের দেশেও পিতা-মাতা, বয়স্কদের প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমার অযোগ্য অবহেলা শুরু হয়েছে।

আচ্ছা দাদু, বছরের বাকী ক'টি দিন তাদের প্রতি ভালবাসা না দেখিয়ে কেবলমাত্র এ দিনটিতে তাদের প্রতি যে ভালবাসা দেখানো হয়, সেটাকে ইসলামী শরীয়ত কিভাবে দেখে? নাতির বিচক্ষণতা দেখে ওরে আমার দাদুভাই বলে শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দাদা আব্দুর রব সাহেব।

শোন দাদুভাই! ইসলামী সমাজে এ সমস্যাটির কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৃদ্ধ পিতামাতা, দাদাদাদী, নানানানীকে সেবা করা মানুষের অন্যতম ফরয দায়িত্ব । সেটি বছরের প্রতিটি দিনেই করতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো দিনকে কেন্দ্র করে তাদেরকে ভালবাসা জানিয়ে তাদের অধিকারের ব্যাপারে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে না। প্রবীণ বা বৃদ্ধদের প্রতি দায়িত্ব শুধু পরিবারেরই নয়, বরং সমাজের সকলেরই। প্রবীণদের সম্মান করা, তাদের সম্মানজনক জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা, তাদের চিকি সারব্যবস্থা করা, দেখতে যাওয়া, তাদের বৃদ্ধবয়সের কষ্ট ও অসুবিধা যথাসম্ভব লাঘব করা ইত্যাদি আমাদের সকলের দায়িত্ব । বিভিন্ন হাদীসে বয়স্ক , প্রবীন বা বৃদ্ধদের মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবংআমাদের প্রবীণ ও বয়স্কদের সম্মান করে না, সে আমার উম্মত নয়” সুনান তিরমিযী : ১৯১৯। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ইমামতি করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে বলা হয়, 'ইলম, আমল ও হিজরতের ব্যাপারে সকলে সমান হলে তাদের মধ্যে যিনি বয়স্ক তিনি ইমামতি করবেন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিরাত, সুন্নাহ বা হাদীস, হিজরতের দিক থেকে সকলে সমান হলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি ইমামতি করবে। সহীহ মুসলিম : ৬৭৩।

সালাতের কাতারের ব্যাপারে যুবক ও ছোটদের ওপর বয়স্কদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও জ্ঞানী তারা যেন আমার কাছে প্রথম কাতারে থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও জ্ঞানে তাদেরকাছাকাছি তারা। অতঃপর যার তাদের নিকটবর্তী তারা। সহীহ মুসলিম : ৪৩২।

ছোট বড় একসাথে থাকলে বড়দেরকে আগে কথা বলতে দেয়া। রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সম্মুখে একবার শিশু আব্দুর রহমান বড়দের আগে কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, বড়কে বলতে দাও, বড়কে বলতে দাও। তখন তিনি চুপ করলেন। সহীহ বুখারী : ৩১৭৩। সামুরা ইবনু যুনদুব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগে আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। আমি তার কাছে হাদীস মুখস্থ করতাম। এসব হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। , শুধু একটি প্রতিবন্ধকই ছিল। আর তা হল, এখানে এমন কতক লোক ছিলেন যারা বয়সে আমার চেয়ে প্রবীণ । তাদের সামনে হাদীস বর্ণনাকে আমি অসমীচীন মনে করতাম। সহীহ মুসলিম : ৯৬৪। সাহাবাগণ এভাবে প্রবীণ ও বয়স্ক লোকদের সম্মান করতেন।

থাম থাম দাদুভাই, সাহাবীর নাম কি যেন বললে? নাতির আগ্রহ দেখেমুখে এক ঝলক হাসি নিয়ে দাদা উত্তর দিলেন, তার নাম সামুরা ইবনু যুনদুব রাদি আল্লাহু আনহু।

ঠিক আছে, দাদা ভাই, তোমার আলোচনা চালিয়ে যাও। শুনতে খুওওওব ভাল লাগছে।
অনুরূপ হাদিয়া দানের ক্ষেত্রেও বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্ লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি মিসওয়াক দিয়ে দাতন করছি। দুই ব্যক্তি আমার কাছে এলো । তাদের মধ্যে একজন বয়সে

অপরজনের চেয়ে বড় ছিল। আমি বয়সে ছোট ব্যক্তিকে মিসওয়াকটি দিতে গেলে আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। অতএব আমি তাদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠকে মিসওয়াকটিদিলাম। সহীহ বুখারী : ২৪৬।

বড় ও বয়স্কদের সম্মান করা মূলত আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর । যিনি বড়দের সম্মান ও ইজ্জত করলেন তিনি যেন আল্লাহকেই সম্মান ও ইজ্জত করলেন। তাদের অধিকার যথাযথ আদায় করাও আল্লাহকে সম্মান করার মত। আবূ মূসা আল-আশআরী রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক যে তাতে অতিরঞ্জিত করেনি তাকে সম্মান করা এবং ন্যায় পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত । সুনান আবু দাউদ : ৪৮৪৩। হাদীসটি হাসান। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোনো যুবক কোনো প্রবীন ব্যক্তিকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে। সুনান তিরমিযী : ২০২২।

বুঝলে দাদুভাই, আমরা যদিহাদীস ও সাহাবীগণের আমলের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, প্রবীণদের অধিকার রক্ষা করা ও তাদের মর্যাদার প্রতি সচেতন থাকার প্রতি ইসলাম জোড়ালো গুরুত্বারোপ করেছে।
আচ্ছা দাদাভাই, বিশ্বের অনেক দেশের কথাই শুনি যেখানে বয়স্ক ও প্রবীণদের জন্য আশ্রম রয়েছে। সেসব দেশে পিতামাতাদাদাদাদি, নানানানি যারাই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন তাদেরকে এসব আশ্রমে পাঠানো হয়। তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনরা স্ব িরনিঃশ্বাস ফেলেন। তাদের এরূপ করা কি ঠিক হচ্ছে ?

দাদুভাই সেটা নিয়ে আরেকদিন কথা বলবো । আজ এতোটুকুই থাক। প্লিজ দাদাভাই বলো না, প্লিজ, প্লিজ , প্লিইইইজ । ঠিক আছে তাহলে শোন , প্রাশ্চত্যের দেশসমূহে নীতি-নৈতিকতার অধঃপতন ও ভোগবাদী চিন্তা -ভাবনা এত প্রবল যে সেখানে মাতা-পিতার খেদমত বা সেবার কথা কল্পনা করা যায় না। সেসব দেশে অগনীত প্রবীণ আশ্রম রয়েছে। বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে তারা এসব আশ্রমে ভর্তি করিয়ে দেয়। তাদের করুণ কাহিনী শুনলে চোখে পানি চলে আছে। একজনের করুণ কাহিনী শুনাচ্ছি তোমাকে । ফাতেমা বেগম নামে ৭২ বছরের এক মায়ের কাহিনী। সে বলল,

‘এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে আমার। স্বামী মারা যাওয়ার পর ভাশুরের আশ্রয়ে ছিলাম। ভাশুর মারা যাওয়ার পর ছেলে আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখেগেছে। সেই যে গেছে আর কোনো দিন দেখতে আসেনি। আমাকে একটু জায়গা দিলে ওদের কিএমন অসুবিধা হতো ? তারপরও আমিতো মা। তাইতো সবসময় চাই আমার ছেলেমেয়েরা ভাল থাকুক, আরও বড় হোক । ' এ ধরনের আরো অনেক কাহিনী রয়েছে। এমনও হয়েছে যে, বৃদ্ধাশ্রমে পিতা মারা গিয়েছে, মারা যাওয়ার সময় তিনি ঘৃণাভরে নিষেধ করে গিয়েছেন, তার মৃত্যুর পর যেন তার কোনো আত্মীয়কে খবর দেয়া না হয়। ছেলে বাবার খবর নিতে গিয়ে শুনেন তিনি কয়েক মাস আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।

দাদুভাই! বয়স্কদের সাথে এরূপ করা জঘন্য অপরাধ। বিশেষ করে কোনো মুসলমান এরূপ করলে তা হবে মহাপাপ। কারণ, ইসলামী শরীয়ত বয়স্কদের যে অধিকারের কথা বলেছে তাতে তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো তো দূরের কথা বরং নিজের চেয়ে উত্তম আবাসস্থলে রাখা উচিত। আর তারা যদি পিতামাতা হন তাহলে সেক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়টি আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহু স্থানেপিতামাতার প্রতি সদাচারণের জোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না ও পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপণীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। তাদের উভয়ের জন্য দয়ার সাথে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে আমাকে তারা লালন-পালন করেছেন। সূরা ১৭ বনী ইসরাইল : ২৩।

শোন দাদুভাই, তোমাকে একটি উদাহরণ দেই, ধর- তুমি একটি গাছ লাগিয়েছ এবং তোমার বন্ধুও একটি গাছ লাগিয়েছে। কিন্তু তোমার বন্ধু গাছের গোড়া কেটে গাছ লাগিয়েছে আর তুমি গোড়াসহ গাছ লাগিয়েছ। দু'জনেই গাছ লাগিয়েছ কিন্তু একজনের গাছ খুব দ্রুত বেড়ে উঠবে আর আরেকজনের গাছ হয়তো বেড়ে উঠবে বা মরে যাবে মাঝপথে। আমাদের পরিবার ব্যবস্থা সেই গোড়া বিহীন গাছ লাগানোর মতই হয়ে যাচ্ছে । আমরা যেখানে পরিবারের কোলে মানুষ হয়েছি, দাদী-নানীর মুখে গল্প শুনে ঘুমিয়েছি, তাদের শাসনে বড় হয়েছি সেখানে বর্তমান প্রজন্ম বড় হচ্ছে যন্ত্রের মাধ্যমে । প্রকৃতির দান এবং যন্ত্রের দান কখনো এক হতে পারে না। উন্নত

জীবিকা নির্বাহের অজুহাতদিয়ে আমরা বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে ছোট পরিবারে চলে যাচ্ছি। বয়স্কদের লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের মাত্রা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা আমাদের জন্য অশুভ সংকেত। আল্লাহ আমাদেরকে এ অশুভ সংকেত থেকে মুক্তি দান করুন।

দাদাভাই, সেদিন আব্বু বলল, বয়স্ক পিতামাতাকে যারা অবহেলা করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে তাদের ব্যাপারে নাকি নতুন কি আইন হয়েছে, তুমি কি সেটা জান?
হ্যাঁ দাদুভাই, আমিও সেটা পড়েছি। ছেলের উপার্জনের ১০ শতাংশ বৃদ্ধ পিতামাতাকে বাধ্যতামূলক দিতে হবে এবং পিতামাতা বা কোনো বৃদ্ধ -বৃদ্ধাকে তাদের সম্মতি ছাড়া বৃদ্ধাশ্রম েদেয়া যাবে না। খবরটি দেখে ভালো লেগেছে। আবার বিষণœও হয়েছি। ভালো লেগেছে এই ভেবে যে, বৃদ্ধ বয়সে অসহায় অবস্থায় ছেলের আয়ের ১০ শতাংশ পেলে জীবন-যাপনের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন তারা। রোগ -ভোগের কিছুটা চিকি সা করাতে পারবেন তারা। আর বিষণœ লেগেছে এ কারণে যে, তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর কথাটিই বা আসবে কেন। একজন সচেতন মুসলিম কখনো এরূপ কাজ কল্পনাও করতে পারে না।

তাহলে দাদাভাই, তোমার গল্প থেকে যা বুঝতে পারলাম তা হলো , কোনো মানুষের জন্যই প্রবীণদেরকে একান্নবর্তী পরিবার থেকে আলাদা করে আশ্রমে পাঠানো উচিত নয়।
ঠিক বলেছ আমার ব্রিলি য়ান্ট দাদুভাই। আমাদের কারো জন্যই উচিত নয়, তাদেরকে কোনো প্রকার আশ্রমে পাঠানো । বরং প্রত্যেককেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী আার্থিক ও মানসিকভাবে তাদের পার্শ্বে দাঁড়াতে হবে। তাদের প্রতি ভালোবাসা , সহানুভূতি, মায়ামমতা দেখাতে হবে। সন্তান ও আত্মীয়দের নিকট প্রবীণ ব্যক্তিব র্গ যথাযথ মর্যাদা ও সেবা-পরিচর্যা পাবে, এটা কোনো অনুকম্পা নয়। বরং এটা তাদের অধিকার। তাদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিতকারীরা ঘৃণ্য ও পাপী ব্যক্তি হিসেবেই পরিগণিত হবে। আজকে তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম, দাদাভাই তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাকেও ধন্যবাদ , দাদুভাই।

লেখক : খতীব, নূরানী জামে মসজিদ, মীরপুর, ঢাকা

১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস
দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে বৈষম্য ও মূল্যস্ফীতি

মুহাম্মদ নকিব

প্রতিবছর ১৭ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য নিরসন দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি প্রস্তাবের (৪৭/১৯৬) আলোকে দিবসটি সে বছর থেকে পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে এবং উন্নত দেশগুলো যাতে তাদের উন্নয়নসহযোগী হয়, সেই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই প্রয়াস জাতিসংঘের। ২০০০ সালে মিলেনিয়াম সামিটে অংশ নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিলো । ২০১৫ আসতে আর বাকী মাত্র ৩ বছর। এরই মধ্যে এই লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে সেটাই প্রশ্ন । বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পরিকল্পনার সময় বলেছিলেন, প্রতিদিন এক ডলারের নীচে আয় যাদের- সেই সব চরম দারিদ্র ্যসীমারনিচে বসবাসরত হার কমানোই তাদের লক্ষ্য । দেখা যাচ্ছে দেশে দেশে দারিদ্র্য রয়ে গেছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪১ কোটি । অন্যদিকে শুধু ভারতেই দরিদ্রের সংখ্যা ৪২ কোটি ।

দরিদ্রঃ বাংলাদেশের চিত্র

দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা পাঁচ হাজার বছর আগের তুলনায়ক্ষমে এলেও আর্থ -সামাজিক বৈষম্য দারিদ্র্যের হার কমে আসার সুফল সেভাবে মিলছে না। সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে (২০১০ সালের হিসাব) গরিব মানুষের অংশ সাড়ে ৩১ শতাংশ। পাঁচ বছর আগে(২০০৫) এই হার ছিল ৪০ শতাংশ। কিন্তু গত দুই বছরে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখী ধারা বজায় থাকায় এই সময়কালে সীমিত আয়ের মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমে গেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুসারে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে নির্ণীত মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ শতাংশ,যা চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ । বিশেষ করে, খাদ্য মুল্যস্ফীতি অধিকহারে বেড়ে চলেছে। আবার পাঁচ বছর

আগের সংগে তুলনা করলে দেশে আয়-বৈষম্য পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি বা বৈষম্য কার্যত কমেনি। খানা আয়-ব্যয় জরিপের (এইচআইইএস-২০১০) উপাত্তানুসারে , পাঁচ বছরে আয়-বৈষম্যের নির্দেশক জিনি-সহজ ২০০৫ সালের দশমিক ৪৬৭ থেকে সামান্য কমে হয়েছে দশমিক ৪৫৮। ইকোনমিক রিসার্চ গ্র“পের মতে বৈষম্য বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি পরিসংখ্যানে সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হলেও বিভিন্নভাবেই তা ফুটে উঠছে। শহরের উন্নতি গ্রামের গরীব মানুষকে শহরে টেনে আনছে। কিন্তু শহরবাসী হয়ে গ্রামের মানুষের আয়-উপার্জন সেই পরিমাণে বাড়ছে না, যা তাকে সত্যিকারের স্বস্তি দিতে পারে। বরং তাদের বেশিরভাগেরই জীবনযাত্রার মান নিু পর্যায়ে রয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটি জানান সামগ্রিকভাবে আর্থ -সামাজিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা বাড়ছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি একভাবে সম্পদ স্থানান্তর ঘটাচ্ছে। পুঁজিবাজারের মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তর ঘটছে। এর ফলে বাড়ছে সংঘাত, যা দারিদ্র্য বিমোচনকে আরও কঠিন করে তুলেছে। সামাজিক অপরাধ বেড়ে যাওয়ার মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটছে। বিশ্বজুড়ে দারিদ্র পরিস্থিতির অগ্রগতি এখন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে খাদ্যমূল্যের ওপর। ২০১১ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘ জানিয়েছিল, বৈশ্বিক দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে। আর তাই ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এমডিজি) অর্জনে দারিদ্র্যের হার ২৩ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক নিচে, এমনকি ১৫ শতাংশের নিচে নেমে যেতে পারে বলে জাতিসংঘ আশাবাদ ব্যক্ত করে।

কিন্তু বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়াসহ ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দারিদ্র্যের হার হ্রাসের সাফল্য ম্লান হয়ে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতেই ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে পালিত হতে যাচ্ছে ‘আন্তর্জাতিকদারিদ্র্য নিরসন দিবস ২০১১'। এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, চরম দারিদ্র্য সীমার অবসান ঘটান: তাদের ক্ষমতা বাড়া, শান্তি ফিরিয়ে আনুন। জাতিসংঘের আহ্বানে ১৯৯৩ সাল থেকে এই দিবস পালন করা হচ্ছে। উন্নয়ন অনে¦ষণের পর্যালোচনা : দেশের বেসরকারী গবেষণাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন অনে¦ষণ দারিদ্র্য ও বৈষম্য পরিস্থিতি নিয়ে তাদের একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ শতাংশে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

উন্নয়ন অণে¦ষণ বলছে, গত প্রায় দুই দশকের (১৯৯১-৯২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত) দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ। আর দারিদ্র্যের হার কমে ২৭ দশমিক ৫০ শতাংশ (২০১৩) ও ১৭ শতাংশ (২০২১) দাঁড়াতে পারে, যা সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশ কম।

দারিদ্র্য বৈষম্য সম্পর্কে বাংলাদেশের পরিকল্পনা দলিলে যা বলা হয়েছে, তা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে । দারিদ্র্যের অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত । গ্রামে ভূমিহীনতার সঙ্গে সঙ্গে শহরে বস্তিবাসীর সংখ্যা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে আবাসন সমস্যা প্রকটতর হচ্ছে। পরিকল্পনা দলিলে এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গ্রামে ভূমিহীনতার প্রক্রিয়া রোধের পথ পদ্ধতি বলা হয়নি। সেই সঙ্গে নগর দরিদ্রদের আবাসন সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিয়ে তেমন কথা নেই। মোট কথা দারিদ্র্য বিমোচনে বাজারকেই প্রধানত হাতিয়ার করে নিয়েছে পরিকল্পনা প্রস্তাবনায় যা দারিদ্র্য -বৈষম্যই শুধুমুয়, আঞ্চলিক বৈষম্যও দূর করতে পারবে না।

কোন কোন গবেষণায় প্রকাশ পায় দেশে ৯ কোটি ৮৯ লাখ মানুষই দরিদ্র । দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হবে আরও বেশি। কারণ বাজার অর্থনীতিতে যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় না এবং প্রকৃত আয় হ্রাস পায় তখন নিম্নমধ্যবিত্তরাও আসলে দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত হিসেবে গণ্য হয়। সে হিসেবে তার মতে দেশে ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ দরিদ্র । উক্ত গবেষণায় বৈষম্যের যে চিত্র বেরিয়ে এসেছে, তা হলো ২০১০ এ মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ধরে নিলে ৪১ লাখ ধনী। ৭০ লাখ উচ্চ -মধ্যবিত্ত । ১ কোটি ৪৬ লাখ মধ্য - মধ্যবিত্ত , ৪ কোটি ৭০ লাখ মধ্যবিত্ত , ২ কোটি ৫৪ লাখ নিম্নমধ্যবিত্ত , ৯ কোটি ৮৯ লাখ নিরঙ্কুশ দরিদ্র । ৫ কোটি ৭৫ লাখ চরম দরিদ্র ।

দরিদ্র দূর করার ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই)-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ' পত্রিকায় ৬ নভেম্বর ২০০৭ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইএফপিআরআই-এর গবেষণার বরাত দিয়ে বলা হয়, ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৯৯০-এর দশকের

শেষ দিক থেকে বাংলাদেশে ‘অতিদরিদ্র ', ‘মাঝারি পর্যায়ের দরিদ্র ' ও ‘দরিদ্র ' মানুষের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু ভারত এ ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য পায়নি।

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডিপ্রাইভড ' শিরোনামে প্রকাশিত আইএফপিআরআই-এর প্রতিবেদনে দৈনিক মাথাপিছু ৫০ সেন্টের কম আয়ের মানুষদের ‘অতি দরিদ্র ', ৫০ থেকে ৭৫ সেন্ট আয়কারীদের ‘মাঝারি দরিদ্র ' ও ৭৫ সেন্ট থেকে ডলার আয় করতে সক্ষম মানুষদের ‘দরিদ্র ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে এখন অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ১৬ কোটি ২০ লাখ। এছাড়া সারা বিশ্বে ৩২ কোটি ২০ লাখ মাঝারি পর্যায়ে র দরিদ্র এবং ৪৮ কোটি ৫০ লাখ দরিদ্র মানুষ রয়েছে। ওই গবেষণায় বলা হয়, সারা বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১২ শতাংশই বাস করে দক্ষিণ এশিয়ায়। ভারতে গত প্রায় এক দশকে মাঝারি দারিদ্র্যের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। তবে প্রতিবেশী বাংলাদেশ বেশি সাফল্য পেয়েছে অতি দরিদ্রের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে । এতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দেশগুলোর চেয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো অনেক বেশি সফল হয়েছে। সারা বিশ্বে ২০০৪ সালে এ বিষয়ে অর্জিত সাফল্যের অর্ধেকই অর্জন করেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো । বাকি ৫০ ভাগের মধ্যে ৩১ শতাংশ সাফল্য পেয়েছে আফ্রিকার দেশগুলো । আর পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দেশগুলোর সাফল্য মাত্র ১৭ শতাংশ। ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে দৈনিক এক ডলারের কম মাথাপিছু আয়ের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২৫ কোটি থেকে কমে ৯৬ কোটি ৯০ লাখে দাঁড়িয়েছে বলে জানানো হয় প্রতিবেদনটিতে ।

গত ১০ বছরে দেশের দারিদ্র্য কমেছে ২৫ শতাংশ। দারিদ্র কমার এ হার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ । এটি অব্যাহত থাকলে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হারসহজেই ২২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের অগ্রগতি শীর্ষক এক উপস্থাপনায় এ তথ্য জানানো হয়। উপস্থাপনাটি প্রদান করেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য ড. শামসুল আলম। উপস্থাপনায় প্রবৃদ্ধির হার ২০১১ অর্থবছরের ৬.৭% থেকে ২০১২ অর্থবছরে ৬.৩% এ নেমে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে ৬ষ্ঠ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা উন্নীত করতে (২০১৫ সালে ৮%) বিদেশী সহায়তা ও বিনিয়োগ দক্ষতার সাথে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা

ক্ষুদ ঋণ আসলে নতুন তত্ব নয়। ব্রিটিশ ভারতে ক্ষুদ্র ঋণের প্রচলন ছিল। যে কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক দাবি আনতে পারেন না। কেউ হয়তো ক্ষুদ্র ঋণের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বা মডেল উদ্ভাবন করতে পারেন। তবে সত্য , এ ঋণের মহত্ব এনজিও'র সুবাদে বেশিমাত্রায় প্রচার পাচ্ছে। এ ঋণের মহত্তবের প্রচারকদের দাবি, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব । কেউ তো আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন, এর মাধ্যমে 'দারিদ্র্যকে জাদুঘরে' পাঠানো সম্ভব হবে। বিষয়টি যে 'গানের চেয়ে বাজনা বেশি' মার্কা প্রচ ার্তা বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বোঝা কঠিন নয়। তবে হ্যাঁ , দারিদ্র্য বিমোচনে , ধনী-গরিব বৈষম্য হ্রাসে ক্ষুদ্র ঋণ ছোট পরিসরে হলেও ভূমিকা রাখতে পারে। ঋণ যেমন ক্ষুদ্র , ভূমিকাও তেমন ক্ষুদ্র । এখন বিষয় হচ্ছে , ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে। দরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বিতা অর্জনে যদি কিছুটা ভূমিকা রাখে, তাহলে এ তত্ত্বেও এত সমালোচনা কেন? সমালোচনা কি ক্ষুদ্র ঋণের, নাকি একটি প্রদানের পদ্ধতির ? অবশ্যই দোষটি ক্ষুদ্র ঋণের নয়, দোষ হচ্ছে পদ্ধতির ।

কৃষি ব্যাংক , কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন ও কৃষি দফতরগুলো কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ দিতে পারে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প করপোরেশন সুদমুক্ত ঋণ দিতে পারে উদ্যোক্তাদের । এ রকম সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজনে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ দিতে পারে। বিশেষ করে পিকেএসএফ সরাসরি সুদমুক্ত ঋণ দিতে পারে। তারা সামান্য সুদে (৩ শতাংশ) এনজিওকে অর্থ দেয়। এনজিওগুলো গ্রাহককে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ সুদে ঋণ দেয়। পিকেএসএফসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান সুদমুক্ত ঋণ দিলে এনজিওগুলো জনসাধারণকে ক্ষুদ্র ঋণের নামে শোষণ করার সুযোগ পাবে না। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা করপোরেট হাউস তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচি র আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এরই মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাও করছে। সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রমে পুরোপুরি দারিদ্র্য বিমোচন হবে না, তবে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রক্রিয়া ত্বরানি ¦ত করবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ: ইসলামি পদ্ধতিনাম সুদের অক্টোপাস

দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিশেষত: বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের নানা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (গরষষবহহরঁস ফবাবষড়ঢ়সবহঃ মড়ধষং) এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বকে দারদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করা। দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম সফল ও কার্যকর উপায় হচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির ঈর্ষণীয় সাফল্য, বিকাশ ও জনপ্রিয়তার প্রেক্ষাপটে দারিদ্র বিমোচন ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী পদ্ধতি বিশেষঃ ইসলামের দরিদ্র কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহের সুসংগঠিত ও পূর্ণ বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। সুদভিত্তিক চরম ভোগবাদী কর্পোরেট অর্থ ব্যবস্থার ফলে বর্তম ানবিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে এবং পুঁজিবাদের লোক দেখানো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে কল্যাণমূলক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতর হয়েছে।

ফেরত দেয়ার শর্তে কাউকে কিছু দিলে সেটাকে বলা হয় কর্জ বা ঋণ। নানা প্রয়োজনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় -স্বজন কিংবা পরিচিতজনের নিকট থেকে কর্জ বা ঋণ নেয়ার ব্যাপারটা মানব সমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। শুধু ঋণগ্রহিতার কল্যাণের জন্য কর্জ দেয়া হলে এবং কেবল আসলটাই ফেরত নিলে সেটা হয় কর্জে হাসানা বা কল্যাণমূলকঋণ। কর্জ দিয়ে ফেরত নেয়ার সময় আসলের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু অতিরিক্ত আদায় করলে সেটা হয় সুদের কারবার। বর্তমানে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ী ও শিল্পউদ্যোক্তাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের বিনিময়ে বিভিন্ন পরিমাণ ঋণ দেয়। এ ঋণ বিশাল অংকেরও হয়েথাকে। ঋণের বিনিময়ে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকে জমি, বাড়ি, শিল্প -কারখানা কিংবা অন্য কোন মূল্যবান দলিল। ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোও বাড়ি, ব্যবসা, কিংবা শিল্প -কারখানার জন্য বিভিন্ন রকম ঋণ দেয়। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের নিয়ম না থাকলেও শরিয়াহ ভিত্তিক লাভের ব্যবস্থা থাকে। অপরদিকে নিুবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষেরা জামানতের অভাবে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ সুবিধা নিতে পারে না। আর এই সব দরিদ্র মানুষদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েই বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা।

সারা বিশ্বের অনুন্নত , স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র ঋণ এখন বিশাল ব্যবসার এক লোভনীয় পণ্য। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। ড. ইউনুসের ভাষায় ক্ষুদ্রঋণের সংজ্ঞা হচ্ছে গরিব ও অসহায় মানুষদের বেঁচেথাকার অবলম্বন খুঁজে দেয়া।

প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ বিশ্বশান্তিতো দূরের কথা, ঋণগ্রহিতাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনেও কোন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। দারিদ্র দূরীকরণে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যর্থতা এবং ঋণগ্রহিতাদের দুর্গতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো এই ঋণের অতি উচ্চ হারের সুদ। ক্ষুদ্রঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ হারের নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ছাড়াও ঋণগ্রহিতাদের নিকট থেকে নানা রকম ফি আদায় করে থাকে। যেমন, সদস্য ফি, বাধ্যতামূলক এককালীন জমা (১০ শতাংশ), গ্র “প ট্যাক্স (৫ শতাংশ), বাধ্যতামূলক সাপ্তাহিক সঞ্চয় ইত্যাদি।

মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সুদকে হারাম করা হয়েছে। অন্যদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসেবে বিত্তবানদের জন্য জাকাতকে করা হয়েছে ফরজ বা বাধ্যতামূলক। বছরের এক সময় বিশেষত: রমজান মাসে সারা বিশ্বের বিত্তবান মুসলমানগণ তাদের অর্থবিত্তের শতকরা ২.৫ ভাগ জাকাতের মাধ্যমে বিত্তহীন দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। তাছাড়া ঈদুল ফিতরের সময় প্রদেয় ফিতরা, কৃষি ও পশুপালনকারীদের প্রদেয় উশর ও অন্যান্য দান-খয়রাতের মাধ্যমেও বিত্তবানদের সম্পদের কিছু অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। এতে দরিদ্ররা সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্য মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারে। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অন্ততঃ এক হাজার কোটি টাকা জাকাত আদায় করা সম্ভব এবং সে টাকা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করলে বিশ/পঁচিশ বছরে বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব। তাই জাকাতের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে সুসংগঠিত জাকাত ব্যবস্থাপনা। সেই সাথে প্রয়োজন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুদভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সুসংগঠিত জাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে জাকাত আদায় এবং এর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হলে অন্ততঃ মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

নিবন্ধ

শিশু অধিকার ও আমাদের শিশু

শরীফ আবদুল গোফরান

অক্টোবর মাস এলেই যেন শিশুদের অধিকারের কথা বেশি বেশি শোনা যায়। মুখরোচক শ্লোগানে বাতাসে ভাসতে থাকে। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় শিশু অধিকার সনদ। সর্বপ্রথম যে কয়টি দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

প্রতি বছরের ন্যায় অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার এবারেও পালিত হবে বিশ্ব শিশু দিবস। পৃথিবীর সবদেশের সচেতন নাগরিকরা শিশুদের নিয়ে ভাবে। স্বপ্ন দেখে নতুন বিশ্ব গড়ার। উন্নত দেশগুলোতে শ্লোগানের পাশাপাশি শিশুদের জন্য রয়েছে নানা রকম সুযোগ সুবিধা। কিন্তু আমাদের দেশে শিশু অধিকার সনদের ৫৪টি ধারার মধ্যে একটি ধারাও আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। আমাদের দেশে শিশুদের জন্য নামমাত্র কিছু সুযোগ সুবিধা রাখা হলেও তা শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ। গ্রাম অঞ্চলে এর কোন বালাই নেই। শিশুদের জন্য খেলাধুলা কিংবা সুন্দর, সচেতনভাবে গড়ে ওঠার কিছু ব্যবস্থা থাকলেওতা সাধারণ বা নিম্নবিত্ত গরীব শিশুদের নাগালের বাইরে। সে সুবিধার ফল ভাগ্যে জোটেনা তাদের। এসব অবস্থাসম্পন্ন ধনীর দুলালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শুধু তাই নয়। নিম্নবিত্ত শিশুদের নেই সঠিক বাসস্থান। নেই দু'বেলা আহারের ব্যবস্থা। কিংবা সুচিকিৎসা আর পড়ালেখার সুযোগ।

অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার যখন বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়, তখন ঘটা করে সেমিনার হয়। আলোচনা হয়। হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালী সেই র‍্যালীতেঅংশ নিয়ে আনন্দে সারাটা দিন কাটিয়ে দেয় কিছু শিশু। লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে র‍্যালীরদিকে খালি গায়ে ছেঁড়া প্যান্ট পরে কত শিশু-কিশোর প্রশ্ন ভরা বিস্ময় চোখে তাকিয়ে থাকে। হয়তো এদের অনেকের পেট তখন ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছে। অথচ জাতিসংঘ 'বিশ্ব মানবাধিকার সনদে' শিশুদের অধিকারগুলো সন্নিবেশিত রয়েছে। দশটি সংক্ষিপ্ত নীতিতে শিশুদের অধিকারগুলো সনদে ঘোষিত আছে। যেমন জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম অথবা জাতীয়তা নির্বিশেষে উল্লেখিত

অধিকারগুলো সব শিশু ভোগ করবে। স্বাধীন , মুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশে বিশেষ নিরাপত্তা ও অবাধ সুযোগ -সুবিধা। একটি নাম ও জাতীয়তা, প্রচুর পুষ্টি , আবাসিক চাহিদা, বিনোদন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সমেত সামাজিক নিরাপত্তা , পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শশ্রুষা , শিক্ষা ও পরিচর্যা , যেখানে যতদূর সম্ভব বাবা-মার যত্নে ও তত্ত্বাবধানে প্রীতি ও সমঝোতা এবং নিরাপত্তা ও স্নেহময় পরিবেশ পাওয়া শিশুর অধিকার। স্বকীয় সত্তা বিকাশে সমান সুযোগ এবং বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও বিনোদন , দুর্যোগের সময় শিশু নিরাপত্তা , অবজ্ঞা , নিষ্ঠুরতা ও শোষণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা , বর্ণ , ধর্ম অন্য যে কোন ধরনের বৈষম্য থেকে নিরাপত্তা এবং শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে তোলাও শিশুর প্রাপ্য অধিকার।

শিশু অধিকার সনদ অনুমোদনের দীর্ঘদিন পার হয়েছে। জাতিসংঘ কি শিশুর জন্য সার্বজনিনভাবে সবগুলো অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে? এতে কি আমাদের শিশুদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। না তা আজও সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। তা হলে আসুন আমরা আমাদের স্বদেশের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখি।

আমাদের দেশে জন্মের এক বছরের মধ্যেই ৪ লক্ষাধিক শিশুর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ, এখানে বন্যা , খরা, ঘুর্ণিঝড় , টর্ণেডো এমনকি সড়ক দুর্ঘটনারও নির্মম শিকার হয় অগণিত শিশু। বিগত ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়েই ৬০ হাজার শিশু প্রাণ হারিয়েছিল। এরপর থেকে ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও আইলায় প্রাণ হারিয়েছে কতো শিশু।

এরপর আসা যাক শিশুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথায়। দরিদ্র মা-বাবা যেখানে প্রতিটি শিশুর মুখে খাদ্য জোটাতেই পারে না, সেখানে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখার সামর্থ কোথায় তাদের? জন্মের এক বছরের মধ্যে হয় ৪ লক্ষাধিক শিশু মারা যায় তার ৩ লাখই মারা যায় অপুষ্টির শিকার হয়ে। তাছাড়া বছরে লক্ষাধিক শিশু হয়ে যায় বিকলাঙ্গ । ৫ বছর বয়সী প্রায় ৭০ ভাগ শিশুই অপুষ্টির শিকার হয়। প্রতিবছর ৩০ হাজারের অধিক স্কুলগামী শিশু ভিটামিন ‘এ'র অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। বিশুদ্ধ পানি ও পাকা পায়খানার অভাবে শিশুরাই এর বড় শিকার হচ্ছে। ডায়রিয়া, কৃমি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরাই বেশি।

এবার আসুন অন্য প্রসঙ্গে । শিক্ষার দিকে যদি নজর করে তাহলে দেখবেন দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থান হেতু এখনও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের বেশির ভাগ শিশু। তবে বর্তমানে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয়ের জন্য এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বাধ্য তামূলক করায় অবস্থার উন্নতি হবে বলে আমরা আশা করি। তবে এজন্য পথ শিশুদের দিকেও নজর বাড়াতে হবে। কারণ পরিসংখ্যান করলে দেখা যায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের অধিকাংশই মানবেতর কঠিন শ্রম আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। পাশাপাশি বহু শিশু অভিভাবক দ্বারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়ে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে আসছে এরা। শিশুরা হত্যারও শিকার হচ্ছে। বাসায় অফিস-আদালতে টেম্পো , বাসে ও হোটেল -রেস্তোরায় যেসব শিশু কাজ করে তারাই বেশী হচ্ছে নির্যাতনের শিকার।

এতক্ষণ আমাদের দেশের শিশুদের অবস্থা তো দেখলেন। মনে মনে ভাবছেন এই যদি হয় অবস্থা তাহলে শিশু অধিকারের বিষয়গুলো তো বাস্তবায়ন সুদূর পরাহত। না, অভিভাবক হিসাবে আমাদের এসব ভাবা মোটেও ঠিক হবে না। আমরা যদি সবাই এগিয়ে আসি, এগিয়ে আসেন মা-বাবাসহ সচেতন নাগরিকরা এবং পাশাপাশি সরকার যদি সচেষ্ট হন তাহলেঅবশ্যই আস্তে আস্তে হলেও অভাগা-বঞ্চিত নির্যাতিত শিশুদের ভাগ্য আমরা পরিবর্তন করতে পারবো । ফুটে উঠবে তাদের মুখের হাসি। তাহলে এ কাজটি আমরা নিজেকে দিয়েই শুরু করি এখন থেকে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলুননা শিশুকে আমরা পৌঁছায়ে দেই স্কুল গৃহে। যে কিশোর আপনার আমার বাসায় কাজ করছে তাকে কিনে দেই বর্ণমালার বই। তাকে অক্ষরজ্ঞান দান করি।

গ্রামের অশিক্ষিত -দরিদ্র মানুষগুলোকে সংগঠিত করে শিশুর শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়গুলো তাদেরকে বুঝিয়ে বলি। দেখবেন একদিন আমাদের দেশেও শিক্ষার হার হয়ে যাবে পাশের দেশ শ্রীলংকারমতো । হয়ে যাবে চীনের মতো । যেখানে চীন ১৯৫১ সালে সাক্ষরতার কর্মসূচি হাতে নিয়ে মাত্র ১০ বছরে শতভাগ সম্পন্ন করেছে। আশ্চর্য হলো , এ জন্যে তাদের একটি স্কুল গৃহও নির্মাণ করতে হয়নি। ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দহলিজ এবং কাছারীগুলোকে তারা স্কুল হিসেবে ব্যবহার করেছে। যেখানে তা ছিল না, সেখানে গাছের নিচে বসে গেছে স্কুল । দরিদ্র বাধা হয়নি। আয়োজনের আন্তরিকতাই ছিল মূল শক্তি ।

আসুন, আমরাও আন্তরিকতা দিয়ে আমাদের বঞ্চিত শিশুদের জীবনের জন্য , তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সর্বোপরি তাদের অধিকারের জন্যে একযোগে কাজ করি। তা হলেই হবে ‘বিশ্ব শিশু দিবস' পালনের সার্থকতা ।

ইবাদত

যিকির ও দোয়া

মাওলানা তাজুল ইসলাম

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, ঈদুল আযহার অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি যিকির ও দোয়ার বিভাগটি। মহান আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে ঈদুল আযহার আনন্দ ও সাওয়াব লাভের তাওফীক দান করুন। আমাদের সম্মুখে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসের সমাগম ঘটতে যাচ্ছে; যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মৌসুম। আল্লাহর যিকর, ফরয ও নফল ইবাদাতের মাধ্যমে সুশোভিত করতে পারি এ মৌসুমটিকে। আর তা হলো যিলহাজ্জ মাস। এ মাসটি যেমনিভাবে হাজীদের জন্য অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ তেমনিভাবে যারা হাজী নন তাদের জন্যও খুবই তা পর্যপূর্ণ। এ মাসে সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ হজ্জকে কেন্দ্র করে তাকওয়া ও ইবাদাত চর্চার এক রূপময় কর্মশালা এবং শির্ক, কুফর ও বিদআ'তমুক্ত হয়ে ঈমানের অনুপম মাহাত্ম্য অর্জনের এক সমৃদ্ধ পাঠশালায় একত্রিতহয়। এ পাঠশালাতেই আল্লাহর সাথে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে এসব বান্দাদের সম্পর্ক, আনুগত্যের নানামুখী সুষমায় সিক্ত হয় তাদের মন, আল্লাহর সামনে দীনতা হীনতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঔজ্জ্বল্য পায় তাদের হৃদয়। আর এ মাসের প্রথম দশক হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহামূল্য বান বোনাস যা গ্রহণের মাধ্যমে যারা হজে যাচ্ছি এবং যারা হজে যাচ্ছি না প্রত্যেকেই অর্জন করতে পারি অসংখ্য -অগণীত ফযীলত, মহত্ব ও সাওয়াব। ইসলামিক স্কলারদের মতে ইসলামি শরীয়তে দু'টি দশক রয়েছে যা অন্যান্য সকল দশক থেকে শ্রেষ্ঠ ও ফযীলতপূর্ণ। দশক দু'টি হলো, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক যা দিনের ভিত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ দশক এবং রমাযানের শেষ দশক যা রাতের ভিত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ দশক। যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক আমাদের দ্বারপ্রান্তে। এ দশকটি সকলের জন্য ইবাদতের ব্যাপক মৌসুম। কারণ এ দশকের আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল। এমনকি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার চেয়েও এ দশকের আমল আরও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "এমন কোনো দিন নেই যে দিনে কৃত নেক আমল এসব দিন অর্থা যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমলের মত আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদের মত নেক আমলও কি নয়? তিনি বলেন, না, আল্লাহর পথে জিহাদের মত নেক আমলও নয়। তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল

নিয়ে আল্লাহর পথে বের হল এবং এর কোনোটা নিয়েই আর ফিরে আসল না তার এ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় । সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম : ৪৮৮ এবং সুনান আবু দাউদ: ২৪৩৮। এ দশকে অনেকগুলো মর্যাদাপূর্ণ ইবাদাত একত্রিত হওয়ায় তা ইবাদাতের মৌসুমে পরিণত হয়েছে। যেমন এতে সংগঠিত হয় উমরা ও হজের কার্যাবলী , এতে রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ দিবস আরাফাতের দিবস, আরও রয়েছে মুসলমানদের আনন্দ উদযাপনের দু'টি দিবসের একটি দিবস কুরবানীর দিবস, রয়েছে নফল রোযা ইত্যাদি। ফাতহুল বারী গ্রন্থের রচয়ীতা হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন, "যিলহাজের প্রথম দশ দিনের বিশেষত্বের কারণ যেটা বলে আমার মনে হয়েছে তা হলো , এ দিনগুলোতে বড় বড় ইবাদত গুলোর যেমন- সালাত, সিয়াম, সাদকা, কুরবানী, উমরা ও হাজের সম্মিলন ঘটে। অন্য কোনো সময় এতো ইবাদত একত্রিত হয় না"।

আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ ও বরকতের যে মৌসুমগুলো আমাদেরকে প্রদান করেছেন মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য হবে দু'আ, ইস্তিগফার , ইবাদাত ও সত্যিকার তাওবার মাধ্যমে মৌসুমগুলোর সদ্ব্যবহার করা। যিনি হজে যাচ্ছেন তিনি হজের কাজগুলো অধিক সাওয়াবের আশায় সম্পন্ন করবেন। আর আমরা যারা হজে যেতে পারিনি আমরা বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতে পারি। মূলতঃ সালাত এমনিতেই একটি অতি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ইবাদাত, তদুপুরি এর সাথে যদি যুক্ত হয় এ বরকতপূর্ণ মৌসুম তাহলে সেটি হবে আরও উত্তম । সাহাবী সাওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, "তোমার উচিত বেশি বেশি সালাত আদায় করা। কেননা তোমার একটি সালাত দ্বারা আল্লাহ তোমাকে এক স্তর উচ্চ মর্যাদায় উঠিয়ে দিবেন এবং তোমার থেকে একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন"। সহীহ মুসলিম : ৪৮৮। আবার এ দিনগুলোতে সাওম পালনের বিশেষ তা পর্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো এক স্ত্রী বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহাজের নয় তারিখে, আশুরার দিন, প্রতিমাসে তিনদিন, মাসের প্রথম সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করতেন। " সুনান আবু দাউদ : ২৪৩৭। বিশেষ করে আরাফার দিনে সাওম পালনের ব্যাপারে হাদীসে অত্যন্ত উ সাহব্যঞ্জক বক্তব্য রয়েছে। এ দিবসের সাওমের ফযীলতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স. বলেন, "আমি আল্লাহর নিকট আশা করি আরাফার দিনে সিয়ামের কারণে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন"। [সহীহ মুসলিম : ১১৬২]। আরাফা দিবসের সাওম

বলতে হাজিগণ যেদিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করে সেই দিনে হাজি ভিন্ন অন্যরা সাওম পালন করাকে বুঝায়। অনেকে নিজ দেশের ৯ তারিখকে কেন্দ্র করে আরাফার সাওম পালন করে থাকেন। সেটি ঠিক নয়। কারণ, হাদীসে ৯ তারিখের কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে আরাফা দিবসের কথা।

এ দশকের অন্যতম একটি আমল হলো বেশি বেশি যিকর ও তাকবীর বলা। ঘরে, মসজিদে, বাজারে, পথে, বাসে, অফিসে সুযোগ পেলেই তাকবীর বলা। রাসূলুল্লাহ স. এ দশকের ফযীলত বর্ণনা করার পর বলেন, "কাজেই তোমরা এ দিনগুলোতে বেশি বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা হ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদু লিল্লাহ ' পাঠ কর"। মুসনাদ আহমাদ: ৫৪৪৬। এ দিনগুলোতে দু'ধরনের যিকর করার বিধান রয়েছে,

এক. ব্যাপক বা অনির্ধারিত যিকর যেমন কুরআন তিলাওয়াত, যে কোনো তাসবীহ, তাকবীর ইত্যাদি। সাহাবাগণ এ দিনগুলোতে বেশি বেশি তাকবীর ও তাসবীহ পড়তেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, "ইবন উমর ও আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু 'আনহুমা যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন তাকবীর দিতে দিতে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হতেন, আর তাদের তাকবীর শুনে লোকজনও তাকবীর দিতেন"। সহীহ বুখারী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০।

দুই. নির্ধারিত যিকর যেমন তাকবীর বলা। জিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রতি ফরয সালাতান্তে একবার নির্দিষ্ট তাকবীর 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু , ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ' বলা। দুই ঈদকে কেন্দ্র করে তাকবীর বলার সুন্নাতটি আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এ সুন্নাতটিকে আকড়ে ধরতে হবে।

এ দশকের আরও একটি আমল হলো , কুরবানীর দিনে সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী করা। আমরা সকলে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা তা করবো ; গোশত খাওয়া বা সমাজে নাম কুড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়। নিজের কুরবানী নিজ হাতে দিবো এটাই হওয়া উচিত। কুরবানীর গোশত তিনভাগে ভাগ করে একভাগ নিজের জন্য , একভাগ আত্মীয়দের জন্য এবং একভাগ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করে তার যথাযথ সাওয়াব অর্জন করতে সকলেই সচেষ্ট

থাকবো । পাশাপাশি কুরবানীর পশু জবাই করাকে কেন্দ্র করে পথ-ঘাট, বাড়ির আঙ্গিনা , মাঠ ইত্যা দি অপরিচ্ছন্ন করে রাখা থেকে আমরা সকলেই বিরত থাকবো । কুরবানীর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সেই স্থানটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে গন্ধ যাতে না থাকে সে পদক্ষেপও গ্রহণ করবো । আমাদের কোনো কারণে প্রতিবেশির বা মহল্লাবাসীর কষ্ট হলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না। কুরবানীর গোশত , রক্ত , চামড়া এর কিছুই আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না। আল্লাহর কাছে পৌঁছবে শুধু তাকওয়ার বিষয়টি। কাজেই সার্বিক দিক থেকে আমাদের তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।

এ দিনগুলোতে আমরা নিষ্ঠার সাথে তাওবা করবো এবং অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবো । সকল মন্দ কাজ থেকে সারা জীবন বিরত থাকার প্রতিজ ্ঞাকরবো । কেননা বরকতপূর্ণ ও মার্যাদাময় সময়ে তওবার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাছাড়া এ সময় নানা রকম ভাল কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন আমাদের মন থাকবে নরম, কৃত পাপের প্রতি অনুশোচনা বোধ হবে তীব্র । ফলে তওবা করার জন্য একটি চমৎকার মানষিক প্রস্তুতি ও পরিবেশ তৈরী হবে। সে সুযোগটিই আমরা গ্রহণ করবো । বান্দাহ তাওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ এতোই খুশি হন যে, তিনি তার পাপগুলোকেও নেক আমলে পরিণত করে দেন। সুবহানাল্লাহ । পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পূণ্য েরদ্বারা । সূরা ২৫ ফুরকান, আয়াত : ৭০। তাওবা ও ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি সৎকাজ করলেই আল্লাহ তাআলা অন্যায়কে ন্যায়ে পরিবর্তন করে দেন। এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কি হতে পারে।

কাজেই আসুন এ দিনগুলোতে সত্যিকার তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ক্ষমা অর্জনে প্রয় াসীহই, সকল পাপ ও নাফরমানী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার অঙ্গিকার ব্যক্ত করি এবং নেক ও ভাল আমলের মাধ্যমে এ দিনগুলোতে আল্লাহর ইবাদত পালনে নিজেদের নিয়োজিত করি। (চলবে.....)

সাক্ষাৎকার

রোহিঙ্গারা শত শত বছর ধরে বার্মায় বসবাস
করছে তাদের অধিকার বঞ্চিত করা যায় না
সাক্ষাৎকারে মানবাধিকার কর্মী হাবিব সিদ্দিকী

মানবাধিকার কর্মী হাবিব সিদ্দিকী রেডিও অস্ট্রেলিয়ায় , ডয়েচে ভেলে ও ভয়েস অব আমেরিকার মিয়ানমার সংবাদদাতা শেখ আজিজুর রহমানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, রোহিঙ্গারা বার্মার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত - বার্মায় অন্যূন ১৩৫ টি জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের মতো তাদেরও অধিকার আছে সে দেশে বসবাসের। তিনি বলেন, আরাকানে জাতিগত নির্মূল অভিযানের পেছনে আছে ১৯৮২ সালের নাগারিকত্ব আইন- যাতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। শত শত বছর ধরে রোহিঙ্গারা এ ভূখণ্ডে বসবাস করছে, তাদের অধিকার বঞ্চিত করা যায় না। রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববাসীর উচিত আরাকানী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চিত করা।

হাবিব সিদ্দিকী একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে সুপরিচিত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তিনি একজন উচ্চকণ্ঠ মানবাধিকার কর্মী । সংবাদপত্রে ও সাময়িকীতে লেখার মাধ্যমে ও ইন্টারনেটে তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি এ কাজ করছেন। শুধু মিয়ানমার নয়, চেচনিয়া, বসনিয়া, কসোভো ফিলিস্তিনী মুসলমানদের জন্যও তিনি লিখে চলেছেন। এ পর্যন্ত তার ১১টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি ইন্টারনেট বইয়ের জগতের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা আমাজন ডট কমের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে । তার সর্ব সাম্প্রতিক গ্রন্থ ডিভোশনাল স্টোরিজ প্রকাশিত হয়েছে মালয়েশিয়ার প্রকাশক এ.এস নূরদীন থেকে।
সাক্ষাতকারের বিস্তারিত বিবরণঃ

প্রশ্ন : রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে বসবাসের কোন অধিকার কি নেই?
উত্তর : অবশ্যই আছে। রোহিঙ্গাদের বার্মায় তাদের মতো আরো ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীর মতো দেশটিতে বাস করার নিরংকুশ অধিকার রয়েছে- কেননা উক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলোকে বর্মী নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য তিনি মিয়ানমার না বলে বার্মা বলছেন,

নোবেল বিজয়ী নেত্র ীঅং সান সুচিও বার্মাই বলে থাকেন। বার্মাকে মিয়ানমার বলার মধ্যেও বর্তমান সরকারের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে তারা মনে করেন।

প্রশ্ন : তাদেরকে স্টেটলেস বা রাষ্ট্রহীন ঘোষণা করে মিয়ানমার কি কোন ভুল করছে?
উত্তর : এই সমস্যার গোড়ায় রয়েছে ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন, যার মাধ্যম ে রোহিঙ্গাদের নাগরিক হওয়ার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। তারা এখন বহিরাগত। তাদেরকে এখন নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে। মিয়ানমারের এই আইন হাস্যকর । কেননা রোহিঙ্গারা যেখানে বহু বছর ধরে বাস করে আসছে- হাজার হাজার বছর আগে তাদের পূর্ব পুরুষেরা আরাকানে বসবাস করছিল। ঐতিহাসিকদের মতে দশম শতাব্দীর আগে যেখানে রাখাইন বা বৌদ্ধরা ছিল না। এর আগে এই অঞ্চল শাসিত হয়েছে ভারতীয়দের দ্বারা যেমনটা তারা শাসন করছিল ত কালীন বাংলাকে। ইতিহাস বলে, আরাকান কালামুখ বা ল্যান্ড অব ব্লাক ফেসেস বলে পরিচিত ছিল। কালো বাদামী বর্ণের এই লোকেরা বাংলাদেশ, চট্ট গ্রামের নি ুাঞ্চলও আরাকানে ছিল।

প্রশ্ন : মিয়ানমার তাদের স্বীকৃতি না দিলে কিংবা তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হলে এই সংকট নিরসন হবে কিভাবে এবং কত দিনে?
উত্তর : বার্মা সরকার ১৯৮২ সালের বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার করলে এবং রোহিঙ্গাদের অন্য ধর্মের মতো সমান অধিকার দিলে অতি সহজেই এ সমস্যা নিরসন হতে পারে। এটা করা হলে শরণার্থী সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না। ১৯৮২ সালের এই আইনে আন্তর্জাতিক কিছু মৌলিক নীতিমালার লংঘন করা হয়েছে। এতে বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণাকে অমান্য করা হয়েছে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য দেশে বা বিদেশে কোন আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এগুলো জাতিসংঘের নীতিমালারও পরিপন্থী । এই আইন করে বার্মা সরকার একটি অপরাধ করেছে এবং তা বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার ৩০টি ধারার সবগুলোর সুস্পষ্ট লংঘন। বার্মা জাতিসংঘের সদস্য হয়ে এটা করতে পারে না। তারা জাতিসংঘের নীতিমালার বাইরেযেতে পারে না। তারা দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সমুন্নত রাখতে পারছে না।

প্রশ্ন : অন্য কোন দেশের কি রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে এগিয়ে আসা উচিত?

উত্তর : হ্যাঁ , বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব রয়েছে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার রক্ষিত না হলে তা নিশ্চিত করা সে দেশের ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বিকিয়ে দেয়া উচিত নয়। যারা আশ্রয় লাভ করতে চায় তাদের ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : অং সান সূচি বলেছেন, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক কিনা তা তার জানা নেই। তার এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কি বলবেন? তিনি কি বর্মী ভোট হারাবার ভয়ে এ কথা বলছেন?
উত্তর : সুচি'র এই মন্তব্য হতাশাজনক। এতে আশাহত হয়েছি। আর কেউ নন, সুচির পিতা জেনারেল অং সান রোহিঙ্গাদের পূর্ণ অধিকার ও সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলছিঃ
‘আমি আপনাদের একটি ব্লাংক চেক দিচ্ছি , আমরা একসাথে বাঁচবো , এক সাথে মরবো । আপনারা যে দাবী করেছেন, তা পূরণ করতে আমি সর্বা িক চেষ্টা চালাবো । স্থানীয় অধিবাসীরা বিভক্ত হলে বার্মার স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হবে। '

বার্মার প্রথম প্রেসিডেন্ট সাও শোয়ে থিক বলেছিলেন: আরাকানের মুসলমানরা বার্মার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অনুরূপ। এদেরকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী মনে করা না হলে আমাদের নিজেদেরকেও তো স্থানীয় বা দেশীয় জনগোষ্ঠী বলা যাবে না। সুচির জানা উচিত আগের নেতৃবৃন্দ আরাকানের মুসলমানদের কিভাবে দেখতেন। তার এই বক্তব্য বিভক্তি উস্কে দেবে যা বার্মার জন্য ভাল হবেনা। বার্মা বিভক্ত হলে তা হবে দুঃখজনক। সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য সুচি একথা বলতে পারেন। কিন্তু এ জনপ্রিয়তা স্থায়ী নয়। সুচির উচিত হবে দীর্ঘ দিনের এ সমস্যার সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেয়া। তার বলা উচিত রোহিঙ্গাদের ও অন্যান্য ব্যক্তি গোষ্ঠীর মানবাধিকারের কথা, যাতে তাদের সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হয়।

প্রশ্ন : মিয়ানমানের সার্বিক পরিবেশ রোহিঙ্গা-বিরোধী হবার কারণ কি বলে মনে করেন?
উত্তর : আমি আগেই আভাস দিয়েছি যে, বার্মা বর্তমানে বর্ণবাদ উস্কে দিয়ে যা করছে বিশ্বের কোন দেশই তা করছে না। বার্মায় বর্মীকরণ ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাব খুবই গভীরতর। তারা চায় বার্মা শুধু বর্মী নাগরিকদের হয়েই থাকুক। সেখানে খৃষ্টান , হিন্দু মুসলমানের কোন স্থান নেই। অন্যদিকে রোহিঙ্গারা মুসলিম। তারা আরাকানের আদি বাসিন্দা : দীর্ঘদিন থেকে তারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত । বর্মী সরকার ও বৌদ্ধরা চায়

রোহিঙ্গারা বার্মা থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। ১৯৪০ এর দশক থেকে এ অপচেষ্টা চলছে। তা কোনক্ রমেই মেনে নেয়া যায় না। তারা অভিযোগ করে থাকে রোহিঙ্গারা অপরাধ করেছে। মানলাম, কয়েকজন অপরাধী অপরাধ করেছে, কিন্তু তার জন্য পুরো জাতি গোষ্ঠী দোষী হবে কেন? অপরাধী ছাড়া বিশ্বের কোথাও কি কোন জনগোষ্ঠী আছে? এ জন্য কি ঐ জাতিগোষ্ঠীর সব লোককে হত্যা করতে হবে? বর্তমানে আরাকানে মুসলমানদের একটা বাড়িও পাওয়া যাবেনা যা আক্রান্ত হয়নি। এমন একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যা অক্ষত আছে। অত্যাচারে নিঃস্ব হয়ে প্রাণভয়ে কিছু কিছু রোহিঙ্গা বাংলাদেশ উপকূলে আশ্রয়ের জন্য পাড়ি জমাচ্ছে কিন্তু সেখানেও জায়গা পাচ্ছে না। এসব লোকের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করার মতো কি কেউ নেই। বিশ্ব সম্প্রদায়ের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত- যাতে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব ফিরে পেতে পারে।

প্রশ্ন : পাঠক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনার শেষ কথা কি?

উত্তর : রোহিঙ্গা সংকট সম্পর্কে কেউ যদি আন্তরিকভাবে জানতে চায় তাকে পক্ষপাতহীনভাবে লেখা বইপত্র পড়তে হবে- বস্তুনিষ্ঠ গবেষকদের লেখা বইপত্র পড়তে হবে। তারা তা করলেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গণহারে দেশত্যাগের শরনার্থী হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। তারা জানতে পারবেন দশম শতাব্দীতে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত লোকদের আগমনের পূর্বে কালো বাদামী আরাকানবাসী ছিল সেখানকারআদি জনগোষ্ঠী । দশম শতাব্দীর শেষের দিকে চীনা-তিব্বতীয় অঞ্চল থেকে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর ব্যাপক আগমন ঘটে- তারাই এখন বার্মায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে শত শত বছর আরাকানীরা ছিল সংখ্যায় অনেক। সে তুলনায় বর্মী বৌদ্ধদের আগমন অনেক পরে। সুলতানী শাসনে বার্মা ছিল বাংলার সুলতানের অধীন। আরাকানের মুদ্রায় এক সময় কলেমাও খচিত ছিল। ব্যাপারটা এমন যে বাড়ির মালিককে অনাহুত অতিথি বা আগ্রাসনকারী বলে বলা হচ্ছে । হাজার বছর ধরে বসবাসকারীরা দেশের নাগরিক অধিকার বঞ্চিত হবে এটা মেনে নেয়া যায় না। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে যা করা হচ্ছে তা অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য : এটা সবাইকে ভাবতে হবে।

অনুবাদ : ফারজানা সুলতানা জবা

নবী জীবনের কথা

সিরাতে ইবনে হিসাম

মূল: ইবনে হিশাম – অনুবাদ: আকরাম ফারুক

বনী আবদুদ দারের এক মহিলার বাঁদী নাহদিয়া ও তাঁর মেয়েকেও তিনি মুক্ত করেন। তাঁদের মনিব যখন তাঁদেরকেকিছু আটা দিয়ে কোথাও পাঠাচ্ছিল এবং বলছিল, "আল্লাহর শপথ, তোদের আমি কখনো মুক্ত করবো না", তখন আবু বাক্র সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কথাটা শোনামাত্রই বললেন, "হে অমুকের মা, তুমি শপথ ভঙ্গ কর। " সে বললো , "কী বলছো ! শপথ ভঙ্গ করবো ? তুমিই তো ওদেরকে খারাপ করেছো । এখন তুমিই মুক্ত কর। " আবু বাক্র বললেন, "আমি ওদেরকে নিয়ে নিলাম। ওরা মুক্ত ও স্বাধীন । " মেয়ে দুটিকে বললেন, "তোমরা মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও। " মেয়েদ্বয় বললো , "হে আবু বাক্র , আগে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেব এবং পরে আটা ফিরিয়ে দেব কি?" আবু বাক্র বললেন, "সে তোমাদের ইচ্ছা। "

আর একবার তিনি বনী মুয়াম্মালের একজন নও মুসলিম বাঁদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছেলেন। উমার তখনো মুশরিক। তিনি মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে গেলেন তখন তাকে বললেন, "তোর কাছে আমি ওজর জানাচ্ছি যে, শুধু ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই তোকে আর মারতে পারলাম না। " মেয়েটি বললো , "আল্লাহ তোমার সাথে যেন এরূপ আচরণই করেন। " এই দৃশ্য দেখে আবু বাক্র তৎক্ষণাত্ বাঁদীটি কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

আবু বাক্রের (রা) পিতা আবু কুহাফা একদিন তাঁকে বললেন, "বেটা, আমি দেখছি তুমি শুধু দুর্বল দাস দাসীদেরকে মুক্ত করছো । যদি তুমি শক্তিশালী জোয়ান পুরুষ দাসদের মুক্ত করতে তাহলে প্রয়োজনের সময় তারা তোমার পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারতো । " একথা শুনে আবু বাক্র বললেন, "হে পিতা! আমি যা করছি তা একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করছি। "

বনু মাখযুম গোত্রের লোকেরা আম্মার ইবনে ইয়াসার ও তাঁর পিতা-মাতাকে তপ্ত দুপুরের সময় মক্কার উত্যপ্ত মরুভূমিতে নিয়ে নির্যাতন করতো । তাঁদের গোটা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ওপর নির্যাতন চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, হে ইয়াসারের পরিবার, ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্র "তি রয়েছে। " আম্মারের মাতাকে (সুমাইয়া) তারা মারতে মারতে মেরেই ফেললো । তথাপি তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি।

আর পাপিষ্ঠ আবু জাহল যখনই শুনতো যে অমুক ইসলাম গ্রহণ করেছে, অমনি তার বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে উস্কিয়ে দিত। ইসলাম গ্রহণকারী যদি ভালো পদমর্যাদাধারী ব্যক্তি হতো তাহলেও তাঁকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতো এবং বলতো , "তুমি তোমার বাপের ধর্ম ত্যাগ করেছ। অথচ তোমার বাপ তোমার চেয়েও উত্তম । কাজেই আমরা তোমাকে বেকুফ প্রতিপন্ন করবো , তোমার মতামত যেোখারাপ ও ভুল, তা আমরা প্রমাণ করে ছাড়বো , তোমার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তবে ক্ষান্ত হবো । " আর যদি তিনি ব্যবসায়ী হতেন তবে তাঁকে বলতো , "আমরা তোমার ব্যবসায়ের সর্বনাশ ঘটাবো এবং তোমার মালপত্র নষ্ট করে দেবো । " আর যদি দুর্বল কেউ হতো তাহলে মারপিট করতো ও তার বিরুদ্ধে লোকজনকে লেলিয়ে দিত।

সাঈদ ইবনে যুবাইর বলেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের ওপর কি এতদূর অত্যাচার চালাতো যার ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করলেও তাদের ওপর দোষারোপ করা চলতো না?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ । তারা তাঁদেরকে প্রহার করত এবং অনাহার ও পিপাসায় কষ্ট দিত। তাঁদের এক একজন এ ধরনের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে এতদূর হীনবল হয়ে পড়তেন যে, সোজা হয়ে বসে থাকতেও পারতেন না। এহেন নির্যাতন চালানোর পর তারা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতো , 'স্বীকার কর আল্লাহর ছাড়া লাত-উয্যাও তোমার মাবুদ?' কেউ কেউ বলতো , 'হ্যাঁ । ' এমনকি একটা তুচ্ছ পোকামাকড়ও দেখিয়ে বলতো , 'আল্লাহ ছাড়া একেও মাবুদ বলে মানতো ?' কেউ কেউ অসহ্য নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনন্যোপায় হয়ে বলতো , 'হ্যাঁ । "

আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের প্রথম হিজরাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লা ল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন একদিকে তাঁর সাহাবীদের ওপর অসহনীয় নির্যাতন চলছে। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা লাভ ও আবু তালিবের সহায়তা লাভের কারণে তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবন যাপন করছেন। অথচ তিনি তাঁদের ওপর আপতিত যুলুমকে কিছুমাত্র রোধ করতে পারছেন না। এ অবস্থায় তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যাও মন্দ হয় না। সেখানে একজন রাজা আছেন যার রাজত্বে কারো ওপর যুলুম নিপীড়ন হয় না। এ দেশটা সত্য ও ন্যায়ের আশ্রয়স্থল । যতদিন এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তোমাদের মুক্ত না করেন ততদিন সেখানেঅবস্থান কর। " এই উপদেশ অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ কুফরীতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হবার আশংকায় এবং নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বাঁচানোর তাকিদে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের জন্য আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এটাই প্রথম হিজরাত।

এই হিজরাতের জন্য যাঁরা প্রথম স্বদেশ ত্যাগ করেনতাঁরা হলেন উসমান ইবনে আফফান ও তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ও তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মুসআব ইবনে উমাইর, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া, উসমান ইবনে মাযউন, 'আমের ইবনে রাবীয়া ও তাঁর স্ত্রী লায়লা বিনতে আবি হাসমা, আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম ও সুহাইল ইবনে বাইদা। এই দশজন আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী প্রথম মুসলমান। (ইবনে হিশামের মতে উসমান ইবনে মাযউন ছিলেন দলনেতা) এরপর দেশত্যাগ করেন জাফর ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তারপর একের পর এক মুসলমানরা সেখানে গিয়ে সমবেত হতে থাকেন। কেউবা সপরিবারে কেউবা পরিবার পরিজন ছেড়ে একাকী। এভাবে যেসব মুসলমান হিজরাত করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে বসবাস করা শুরু করেন, তাঁদের সংখ্যা সর্বমোট ৮৩ জনে দাঁড়ায়। অবশ্য যেসব অল্পবয়স্ক শিশু কিশোর তাঁদের সাথে গিয়েছিল কিংবা সেখানে যাওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেছিল তারা এ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। (চলবে...)

সময়ের ভাবনা

সংলাপ নয়, যুদ্ধেই সিরিয়া সমস্যার সমাধান?
ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পুরনো কৌশল

মতিন মাহমুদ

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান সিরিয়া সংকটের কোন সমাধান করতে না পেরে সরে দাঁড়াবার পর জাতিসংঘ ও আরব লীগের নতুন শান্তিদূত লাখদার ব্রাহিমী দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর আরব লীগ ও মিসরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যদিয়ে তিনি তার মিশন শুরু করেন। প্রায় ১৮ মাস চলা সিরিয়ার ভয়াবহ সহিংসতা বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে বিভক্তি দেখা দেয়ায় কফি আনান এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ব্রাহিমি কতখানি করতে পারেন এখন সেটাই প্রশ্ন । তবে কোন কোন সূত্র থেকে বলা হচ্ছে অশান্ত সিরিয়ায় শান্তির বারতা আনতে তিনি চেষ্টা চালাচ্ছেন নিরন্তর । বিশ্লেষকেরা বলছেন, সিরীয় সংকটে আলোর দিশা পাওয়ার আশা ক্ষীণ । পরাশক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে বিভেদই এ পথে বড় বাধা।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক লেখক ও গবেষক নেইল প্যাট্রিকের মতে, সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রাহিমির মিশনের সাফল্যের সম্ভাবনাখুবই ক্ষীণ । আরেক গবেষক জিয়াদ মাজিদও তাঁর সঙ্গে একমত। তাঁর মতে, যদিও জটিল সব সংকট মোকাবেলায় ব্রাহিমির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবে সিরীয় সংকট উত্তরণে এই ঝানু কূটনীতিকের সফলতার আশা খুব ক্ষীণ । সংকট নিরসনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আলজেরিয়ার সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘ-আরব লিগের বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব নেন। তাঁর আগে এ পদে ছিলেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান। ছয় মাস ধরে নানা চেষ্টার পরও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সহিংসতা বন্ধে কূলকিনারা না পেয়ে আনান গত ৩০ আগস্ট তিনি পদত্যাগ করেন।

আনানের অভিযোগ ছিল, তিনি তাঁর ছয় দফা শান্তি পরিকল্পনার বিষয় পরাশক্তিধর দেশগুলোর কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তাঁর অভিযোগের তীর ছিল বিশেষ করে

নিরাপত্তা পরিষদের দিকে, যেখানে দামেস্কের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাসের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা রাশিয়া ও চীনের ভেটোর কারণে নস্যা হয়ে যায়।

গবেষক মাজিদ বলেন, ‘এখনো এমন কিছুই ঘটেনি, যাতে ব্রাহিমির মিশন সাফল্যের পথে হাঁটছে বলে ধারণা করা যায়। আমার মনে হচ্ছে , আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মেনে নিতে চলেছে, সংলাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নয়; যুদ্ধের মাঠেই এই সংঘাতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ' গবেষক প্যাট্রিকের মতে, আপস করার ব্যাপারে কোনো পক্ষই আগ্রহী নয়। সিরিয়ার সরকার ব্রাহিমির সঙ্গে কথা বলবে। তারা দেখাতে চাইবে, কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় তারা আগ্রহী । তবে বাস্তবতা হচ্ছে , সিরিয়ার কোনো পক্ষই আপস করতে আগ্রহী নয়। এত সব প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সিরিয়ায় ব্রাহিমির কাজটা অনেক কঠিন হবে। যদি তিনি সেখানে সফলতা পানও, তবে তা দীর্ঘদিনের নিরলস পরিশ্রমের পরই সম্ভব বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ।

এদিকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি একটি মসজিদের বাইরে বোমা হামলায় কমপক্ষে পাঁচজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ছয়জন। দামেস্কের ফিলিস্তিনি শরণার্থী অধ্যুষিত আরেকটি এলাকায় একই দিনে চলেছে সরকারি বাহিনীর বোমাবর্ষণ । এতে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় অধিবাসীরা।

সিরিয়ায় অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র আলেপ্পোকে ঘিরে এখন মূল লড়াই চললেও বিদ্রোহীরা প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী দামস্কে সরকারি বাহিনীর ওপরও হামলা চালাচ্ছে। ৭ সেপ্টেম্বর বোমা হামলা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় টিভিতে বলা হয়েছে, দামেস্কের ‘রুকন আল দিন' এলাকায় একটি মোটর সাইকেলে সন্ত্রাসীদের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। লোকজন জুম্মার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরোনোর সময় তাদের ওপর এ হামলা হয়। এদিন সিরিয়াজুড়ে লড়াইয়ে সরকার বিরোধী ৫৫ জন নিহত হয়েছে বলে দাবি করার পর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর এ হামলা হলো । দামেস্কের তথ্য মন্ত্ রণালয় এবং প্রধান আদালত প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি এলাকায় একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণও ঘটেছে বলে জানা গেছে। তবে এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, হামলাটি দামেস্কের নিরাপত্তা পাহারা এলাকা লক্ষ্য করেই চালানো হয়েছে। ওদিকে ফিলিস্তিনি শরণার্থী এলাকায় সরকারি বাহিনীর গোলা হামলায় অন্তত ১০ জন

নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় এক অধিবাসী। দামেস্কের উপকণ্ঠে দু'টি শহরের অধিবাসীরা ৪৫টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। তবে এসব লাশের পরিচয় জানা যায়নি। সিরিয়ান অবজারভেটরি হিউম্যান রাইটস জানায়, জামালকার পূর্বাঞ্চলীয় শহরতলীতে নারী ও শিশুসহ ২৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধারকরা হয়েছে। এছাড়া রাজধানীর দক্ষিণ -পূর্বে কোয়াটানায় অপর ২২ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বিরোধীরা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকারি বাহিনীকে দায়ি করে বলেছে, এটি বাশার আল আসাদের নতুন একটি হত্যাযজ্ঞ । প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে চলমান গণআন্দোলন সম্প্রতি কয়েক মাসে অনেক বেশি রক্ষক্ষয়ী হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহীরা আসাদের ক্ষমতার কেন্দ্র দামেস্ক এবং আলেপ্পোর পতন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে লড়ছে। আসাদ বাহিনীর ট্যাংক , সেনা ও বিমান হামলার পাল্টা জবাব দিচ্ছে বিদ্রোহীরা । এরকম একটি পরিস্থিতিতে লাখদার ব্রাহিমীর মিশন কতখানি সাফল্য বয়ে আনবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পুরনো কৌশল

কানাডা ইরানে তাদের দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি সব ইরানি কূটনীতিককে কানাডা থেকে বহিস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৭ সেপ্টেম্বর তারা এ ঘোষণা দেয়। বিশ্বশান্তির জন্য ইরান বড় ধরনের হুমকি এমন দাবি করে এ পদক্ষেপ নিয়েছে কানাডা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে ইরানের সহযোগিতা , ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ও দেশটির সঙ্গে ইসরায়েলের বৈরী সম্পর্কের কারণে কানাডা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন বেইর্ড এক বিবৃতিতে বলেন, ইরান আজকের দিনে গোটা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় ধরনের হুমকি। এ কারণে ইরানের সঙ্গে কানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত করেছে।

অন্যদিকে ইরানের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাকি দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য , ফ্রান্স ও জার্মানি । ইরানের বিতর্কিত পারমাণবিক কর্মসূচির অভিযোগ এনে দেশ তিনটি এই আহ্বান জানায়।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুইডো ওয়েস্টারভেলি বলেন, বৈঠকে ইরান কোনো ধরনের ‘গঠনমূলক ইচ্ছা' দেখায়নি। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। গত ৭ সেপ্টেম্বর সাইপ্রাসে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরা ফোবিয়াস ও যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগও একই ধরনের মন্তব্য করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, তেহরান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধী চুক্তি (এনপিটি) লংঘন করে গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু ইরান বারবার ওই অভিযোগ নাকচ করে আসছে। তারা বলছে, তেহরান কোনো সামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক কর্মসূচি চালাচ্ছে না, বরং তাদের কর্মসূচি শান্তিপূর্ ণ ও বেসামরিক উদ্দেশ্যে । তারা এনপিটির শর্ত মেনেই তা করছে।

ইরানের সঙ্গে সর্বশেষ আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে গুইডো ওয়েস্টারভেলি বলেন, ওই আলোচনায় ইরানের পক্ষ থেকে গঠনমূলক কিছু করা হয়নি। তিনি জানান, তারা যদি আলোচনার টেবিলে ফিরে না আসে, তাহলে শিগগিরই নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। তা আগামী বছর নয়, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই করতে হবে। উইলিয়াম হেগ বলেন, সর্বশেষ জুলাইয়ে ইরানের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তা বেশ কাজে দিয়েছে। সে সময় ইইউও আন্তর্জাতিক বাজারে ইরানের তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এখন ইরানের ওপর চাপ বৃদ্ধি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। লরা ফোবিয়াস বলেন, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখন অচলহয়ে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যে ইরানের ওপর সম্ভাব্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইরান গত মাসে সাফল্যের সঙ্গে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর ৩টি দেশ এ দাবী জানালো । কার্যত বিশ্বশক্তিকে টেক্কা দিয়ে ন্যাম সম্মেলনের আয়োজন করে ফুরফুরে মেজাজে আছে ইরান। রাশিয়া, ভারতসহ বহু দেশ ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ । নিষেধাজ্ঞা আরোপের পুরনো কৌশল কতখানি কাজ দেবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

চয়ন

রাসূলের (সা:) যুগোপযোগী স্বাধীনতা

মূল: আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ: মওলানা আবদুল মুনয়েম; অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী
মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

॥ একত্রিশ ॥

স্বামী -স্ত্রীর মাঝে পারিবারিক দায়িত্ব বন্টন

স্বামীর দায়িত্ব

ক- কর্তৃত্ব

"আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের ওপর দায়িত্বশীল এবং তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। " (বুখারী ও মুসলিম)

খ-ব্যয়ভার বহন

"হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের উপর তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের সঙ্গত অধিকার আছে। " (মুসলিম)

স্ত্রীদায়িত্ব

ক. সন্তান লালন-পালন ও তাদের শিক্ষা দান

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ স্ত্রী তার স্বামীর পরিবারের লোকজন ও সন্তান -সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল এবং তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। " (বুখারী ও মুসলিম)

খ. গৃহ পরিচর্যা

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল এবং তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। ” (বুখারী ও মুসলিম)

দায়িত্ব পালনে স্বামী -স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা

বিবেচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে সহযোগি তা

“হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ আল্লার শপথ। তিনি মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের যা বণ্টন করে দিয়েছেন জাহেলিয়াতের যুগে থাকলে আমরা এর বিন্দু পরিমাণও তাদেরকে দিতাম না। তিনি বলেনঃ একবার আমি একটি বিষয় নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী এসে বলল, আপনি যদি এরকম করতেন তাহলে ভাল হতো । আমি তাকে বললাম, তোমার এখানে কি কাজ? আমার কাজে তোমার নাক গলাবার দরকার নেই। জবাবে সে বলল, হে ইবনে খাত্তাব ! আপনার আচরণে আমি বিস্মিত হলাম। আপনি চান না আপনার সাথে কেউ কথা কাটাকাটি করুক। অথচ আপনার মেয়ে (হাফসঃ)া রসূলুল্লাহর (স) সাথে কথা কাটাকাটি করে থাকে। এমন কি তিনি কোন কোন দিন রাগও করেন। ” বুখারী ও মুসলিম)

“হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ আমরা কুরাইশরা মেয়েদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতাম। এরপর আমরা আনসারদের সংস্পর্শে এলাম। তাদের মেয়েরা তাদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতো । তাই আমাদের মেয়েরাও আনসার মেয়েদের স্বভাব গ্রহণ করতে শুরু করল। এরপর আমার স্ত্রী আমার সাথে তর্ক -বিতর্ক করতে লাগল। আর আমি এটা অপছন্দ করতে লাগলাম। এতে সে আপত্তি করে বললঃ আপনি কেন এটা অপছন্দ করবেন? আল্লাহর শপথ, রসূল (স)-এর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে তর্ক -বিতর্ক করে। এমনকি তাদের একজন তো অভিমান করে সারাদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। হযরত উমার (রা) বললেনঃ এ ঘটনায় আমি খুবই শঙ্কিত হলাম। ” (বুখারী ও মুসলিম)

হাফেয ইবনে হাজার বলেনঃ হাদীসে নারীদের উপর অধিকতর চাপ প্রয়োগকে নিন্দা করা হয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ (স) কুরাইশদের নীতি বর্জন করে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে আনসারদের নীতি অবলম্বন করেন।

ব্যয়ভার বহনে পারস্পরিক সহযোগিতা

“হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নবকে বলেনঃ তোমার দান লাভ করার ব্যাপারে তোমার স্বামীও তোমার সন্তানরাই অগ্রগণ্য । (বুখারী)

সন্তান লাল-পালনে সহযোগিতা

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেনঃ “আর তোমার প্রতি সন্তানদের অধিকার রয়েছে। ”(মুসলিম)

গৃহ পরিচর্যায় সহযোগিতা

“হযরত আসওয়াদ থেকে বর্ণিত । তিনিবলেনঃ আমি আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল (স) ঘরে কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেনঃ তিনি ঘরের লোকদের সেবায় অংশ নিতেন। আর যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখনই তিনি সালাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। ” (বুখারী)

হাফেয ইবনে হাজার বলেন ইমাম আহমদ ইবনে সাদ থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাকে ইবনে হিব্বান সহী বলেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (স) নিজের কাপড় সেলাই ও জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ করতেন, যা সাধারণত পুরুষগণ নিজের বাড়িতে করে থাকে। ”

স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ ছাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল দীনি বা চারিত্রিক ব্যাপারে ছাবেতের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু আমি কুফরীর ভয় করি। জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়েদেবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ দেব। এরপর তিনি বাগান ফিরিয়ে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য ছাবেতকে আদেশ দিলেন এবং তিনি তাই করলেন। ” (বুখারী)

হাফেয ইবনে হাজার বলেনঃ হাদীসে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। যেমন বিচ্ছিন্নতা শুধুমাত্র স্ত্রীর পক্ষথেকে হলে খুলা ও ফিদিয়া জায়েয হবে। বিচ্ছেদের চাহিদা উভয়ের মধ্যে পাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর এটা তখনই বৈধ হবে, যখন স্ত্রী স্বামীর সাথে বসবাস অপছন্দ করবে; যদিও সে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করবে না। অথবা বিচ্ছেদের কোন উপযুক্ত কারণ দেখতে পাবে না। এর সাথে আরো যুক্ত হয়েছেস্ত্রীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা।
কাযী ইবনে রুশদ বলেছেনঃ স্বামী স্ত্রীকে অপছন্দ করলে স্বামীর হাতে রয়েছে তালাক প্রদান করার অধিকার। অপরদিকে স্ত্রী স্বামীকে অপছন্দ করলে স্ত্রীর রয়েছে খুলার অধিকার।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীর মর্যাদার ঘোষণা

মা হিসেবে নারীর মর্যাদাঃ- উম্মু জুরাইজ

“হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ শুধুমাত্র তিন ব্যক্তিই দোলনায় কথা বলেছেন। (তাদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন) ঈসা ইবনে মারয়াম ও জুরাইজের সঙ্গী । জুরাইজ একজন আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি ইবাদতখানা তৈরি করে সেখানে থাকতেন। একদিন তাঁর মা তাঁর কাছে এলেন। তখন তিনি সালাতে রত ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জুরাইজ। জুরাইজ বললেনঃ হে প্রভু ! আমার মা এবং আমার সালাত। তখন তিনি সালাতের দিকেই ফিরলেন। তাঁর মা চলে গেলেন। পরদিন তাঁর মা এসে তাঁকে সালাতে রত দেখলেন এবং হে জুরাইজ বলে ডাক দিলেন। জুরাইজ এবারও বললেন, হে প্রভু ! আমার মা এবং আমার সালাত। এই বলে তিনি সালাতের দিকে ফিরলেন। সেদিনও তাঁর মা চলে গেলেন। পরের দিন আবার এসে তাঁর মা তাঁকে সালাতে রত দেখলেন। আবার ডাক দিলেন- হে জুরাইজ! জুরাইজ আগের মত বললেনঃ হে প্রভু ! আমার মা। এই বলে তিনি সালাতের দিকে মনোযোগ দিলেন। মা বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ ! বেশ্যা রমনীদের চেহারা না দেখিয়ে তাকে তুমি মৃত্যু দিয়ো না। জুরাইজ ও তাঁর ইবাদত সম্পর্কে বনী ঈসরাইলদের মধ্যে ব্যাপক জানাজানি হয়ে গেল। এক সুন্দরী বেশ্যা মহিলা তাকে বিপদগ্রস্ত করতেউদ্যাত হলো এবং বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে বলল, তোমরা চাইলে আমি তাকে বিপদে ফেলতে পারি। এরপরে সে তার কাছে গেল। কিন্তু তিনি (জুরাইজ) সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ঐ ইবাদতখানায় এক রাখাল আশ্রয় নিয়েছিল। মহিলা তার সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করল এবং তাতে সে গর্ভবতী

হলো । তারপর সে সন্তান প্রসব করল এবং বললঃ এ সন্তান জুরাইজের। লোকেরা তাকে (জুরাইজ) ইবাদতখানা থেকে নামিয়ে মারধর করতে লাগলো এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বললোঃ তুমি এই মহিলার সংগে যিনায় লিপ্ত হয়েছো । আর তাতেই সন্তান জন্ম নিয়েছে। তিনি বললেনঃ সে সন্তান কোথায় ? তারা তখন সন্তানটি নিয়ে এলো । তিনি বললেন, আমাকে সালাত আদায় করার সুযোগ দাও। তিনি সালাত আদায় করে ঐ ছেলেটির পেটে আঘাত করে বললেন, হে ব□স্য ! তোমার পিতা কে? ছেলেটি বলল, অমুক রাখাল আমার পিতা। এর পরে লোকেরা তাঁকে চুমু দিতে ও আলিঙ্গন করতে লাগলো এবং বললোঃ স্বর্ণ দিয়ে তোমার ইবাদাতখানা আমরা তৈরি করে দেব। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, সেটা যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করে দাও। তখন তারা সেভাবে পুনর্নির্মাণ করে দিল। ” (বুখারী ও মুসলিম এবং বর্ণনাটি মুসলিম শরীফের) (চলবে)

মাসআলা-মাসায়েল

মাও: মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

যে সব কারণে জামাত ত্যাগ করা যায়

আমরা জানি, পুরুষের জন্য সালাত জামাআতে আদায় করা ওয়াজিব। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ওয়াজিব তরক করার অনুমতি রয়েছে। কারণ, ইসলামী আইন সাধ্যের অতীত কাউকে ভার অর্পন করে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কখনও তোমাদের কষ্ট দিতে চান না'। সূরা-৫ মায়িদা, আয়াত-৬। সে সব কারণে জামাআত ছাড়ার অনুমতি রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. ঝড়, বৃষ্টি , কাদা, প্রচণ্ড শীত বা গ্রীষ্ম : প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি , কাদা হলে অথবা খুব বেশি শীত বা গরম পড়লে জামাআতে অংশগ্রহণ না করে ঘরে সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে। একদা ঠাণ্ডা ও বাতাসের রাতে ইবনু উমার রা. আযান দিলেন। তাতে তিনি বললেন, 'শোন ! তোমরা স্বগৃহে সালাত আদায় করে নাও। অতঃপর তিনি বললেন, বৃষ্টিময় ঠান্ডা রাতে আল্লাহর রাসূল মুআযযিনকে এই বলতে আদেশ দিতেন, শোন ! তোমরা স্বগৃহে সালাত আদায় করে নাও। সহীহ বুখারী : ৬৩২।

২. ভয় ও রোগ : পথিমধ্যে শত্রু , হিংস্র জন্তু বা যালিমের ভয়, ঘর ছেড়ে গেলে ঘরে চুরি হওয়ার কিংবা পাহারা ছেড়ে গেলে কোনো সম্পদ, ফল, ফসল ইত্যাদি চুরি হওয়ার ভয়, ইজ্জতহানি হওয়ার ভয় অথবা অন্য কোনো প্রকার বড় ক্ষতির আশঙ্কা হলে জামাআত মাফ। কারণ এ সবগুলোই শরয়ী ওযর। আর শরয়ী ওযরের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে জামাআতে শরীক হয় না, তার সালাত হয় না তবে যদি শরয়ী ওযর থাকলে ভিন্ন কথা"। সুনান ইবনু মাজাহ : ৭৯৩।

অনুরূপ যে অসুস্থতায় মসজিদে আসতে খুবই কষ্ট হয়, তাতে জামাআত ছাড়ার অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. খুব বেশি অসুস্থ হয়ে গেলে আবু বকর রা. ইমামতি করার নির্দেশ দেন আর তিনি ঘরে সালাত আদায় করেন।

৩. প্রস্রাব -পায়খানার চাপ : প্রস্রাব বা পায়খানার চাপসহ জামাআতে অংশগ্রহণ নিষেধ। বরং নামাযী ব্যক্তির জন্য উচিত হবে প্রস্রাব -পায়খানার চাপ থাকলে সেটা সম্পন্ন করে তারপর জামাআতে শরীক হওয়া। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, প্রস্রাব বা পায়খানার বেগ দমিয়ে রেখে সালাত আদায় করলে তা হবে না। সহীহ মুসলিম: ৫৬০।

৪. খাবার প্রস্তুত থাকা এবং মন সেদিকে ঝুকে থাকা : খাবার প্রস্তুত ও উপস্থিত থাকলে এবং মনও খেতে চাইছে এমন হলে আগে খাওয়ার কাজ শেষ করে একাকী সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে। মহানবী স. বলেন, যখন কেউ খেতে বসবে তখন খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত সে যেন তাড়াহুড়া না করে; যদিও সালাত শুমানদও হয়ে যায়। সহীহ বুখারী : ৬৭৪। মহানবী স. আরও বলেন, যদি খাবার উপস্থিত থাকে এবং ইকামত দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা আগে খানা খেয়ে নাও। সহীহ বুখারী : ৬৭১।

৫. মুখে, দেহে বা লেবাসে দুর্গন্ধ থাকলে তার জামাআতে শরীক না হওয়াই উত্তম । মহানবী স. বলেন, যে ব্যক্তি দুর্গন্ধ জাতীয় কিছু খেয়েছে সে আমাদের মসজিদ থেকে দূরে চলে যাক; বরং সে তার ঘরে গিয়ে বসুক। সহীহ মুসলিম : ৫৬৪। অনুরূপ মাছ, গোস্ত , মুরগী ইত্যাদি বিক্রেতার গায়ে দুর্গন্ধ থাকলে তা দূরা করার আগে জামাআতে শরীক হওয়া তার জন্য সমুচিত নয়।

৬. জামাতের সময় ঘুমের চাপ সামলাতে না পারলে : কারো প্রচণ্ড ঘুম পেলে আগে ঘুমিয়ে নিয়ে পরে সালাত আদায় করতে হবে। এ কারণে সালাতের জামাআত ছুটলেও তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

৭. ইজ্জত ঢাকার মত পোশাক না থাকলে জামাআতে শরীক না হয়ে ঘরেই সালাত আদায় করা উত্তম ।

৮. সফরে বের হয়ে সঙ্গী ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে জামাআত ত্যাগ করা যাবে।

৯. অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে অথবা সমাজ তার শরয়ী বয়কট করলে জামাআত ত্যাগ করা বৈধ। যেমন হিলাল বিন উমাইয়া এবং মুরাবাহ বিন রাবীর সাথে মহানবী স. ও তাঁর সাহাবাগণ বয়কট করলে তাঁরা স্বগৃহেই অবস্থান করেছিলেন। সহীহ বুখারী : ৪৪১৮।

১০. তায়াম্মুমকারী পানি পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে উযূ করতে গিয়ে জামাআত ছুটলে দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে সালাতআদায় করলে তা হবে না। যেমন জামাআত শেষ হতে চলল দেখেও পানি থাকতে তায়াম্মুম করে জামায়াতে শামিল হয়ে সালাত আদায় করলেও সালাত বিশুদ্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে উযূ করাই জমানদণ্ডরী ; যদিও জামাআত ছুটে যায়।

জামাতে হাজির হওয়ার গভীর আগ্রহ , ব্যকুলতা ও আন্তরিকতা থাকা সত্বে ও কেউ শরয়ী ওযরের কারণে জামাআতে উপস্থিত হতে না পারলেও জামাতের সাওয়াব লাভ করবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি শত চেষ্টার পর মসজিদে এসে দেখে জামাআত শেষ হয়ে গেছে, সে ব্যক্তিও গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে এবং জামাআতের সাওয়াব পাবে। মহানবী স. বলেন, যে ব্যক্তি স্বগৃহে সুন্দরভাবে উযূ করে মসজিদে যায় এবং দেখে যে, লোকেরা সালাত শেষ করে নিয়েছে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাদের মতই সাওয়াব দান করেন যারা জামাআতে হাযির থেকে সালাত পড়েছে। আর এতে তাদের কিঞ্চিত পরিমাণও সাওয়াব কম হয় না। সুনান আবু দাউদ : ৫৬৪। (চলবে)

ইসলামে হালাল-হারাম

মাওলানা আবদুর রহীম

২য় পর্ব

যাদের সাথে বিবাহ হারাম: এ বিষয়ে গত সংখ্যায় আমরা কিছু আলোচনা করে আসছি এর বাকী অংশ কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ৩য় টিকা থেকে তুলে ধরা হলো -

৩. স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয় অথবা তার মধ্যে এমন কোন ত্রটি থাকে যে জন্য স্বামী তাকে অপছন্দ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে স্ব ামীরতৎক্ষণাত্ হতাশ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হওয়া উচিত নয়। যতদূর সম্ভব তাকে অবশ্যই ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, স্ত্রী সুন্দরী হয়না ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অন্যান্য এমন কিছু গুণাবলী থাকে, যা দাম্পত্য জীবনে সুন্দর মুখের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করে। যদি সে তার এই গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পায়, তাহলে তার স্বামী রত্নটি যিনি প্রথম দিকে শুধুমাত্র স্ত্রীর অসুন্দর মুখশ্রী দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এখন দেখা যাবে তার চরিত্র মাধুর্যে তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। এমনিভাবে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের শুরুতে স্ত্রীর কোন কোন কথা ও আচরণ স্বামীর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে এবং এজন্য স্ত্রীর ব্যাপারে তার মন ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু সে ধৈর্য্য ধারণ করলে এবং স্ত্রীকে তার সম্ভাব্য সকল যোগ্যতার বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে সে নিজেই অনুধাবন করতে পারে যে, তার স্ত্রীর মধ্যকার দোষের তুলনায় গুণ অনেক বেশি। কাজেই দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তালাক হচ্ছে সর্বশেষ উপায়। একান্ত অপরিহার্য ও অনিবার্য অবস্থায়ই এর ব্যবহার হওয়া উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তালাক যায়েজ হলেও দুনিয়ার সমস্ত জায়েয কাজের মধ্যে এটি আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচাইতে অপছন্দনীয় ।

অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “বিয়ে করো এবং তালাক দিয়োনা । কারণ আল্লাহ তায়ালা এমন সব পুরুষ ও নারীকে পছন্দ করেন না যারা ভ্রমরের মতো ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায়।

৪. পাকাপোক্ত অঙ্গীকার অর্থ বিয়ে। কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবুত ও শক্তিশালী অঙ্গীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবুতীর ওপর ভরসা করেই একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইচ্ছায় এ অঙ্গীকার ও চুক্তিভঙ্গ করেতাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ করেছিল তা ফিরিয়ে নেবার অধিকার তার থাকেনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“আর তাদের যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। (সূরা বাকারা ২২৮)

অর্থা মোহরানা , গহনাপত্র ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। যেগুলো ইতিপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল। যেগুলোর কোন একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার নেই। এমনিতেই কোন ব্যক্তিকে দান বা উপহার হিসেবে কোন জিনিস দিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়া ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এই ঘৃণ্য কাজকে হাদীসে এমন কুকুরের কাজেরসাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু বিশেষ করে একজন স্বামীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করার সময় সে নিজে তাকে এক সময় যা কিছু দিয়েছিলো সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর । বিপরীত পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিয়েবিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করার নৈতিক আচরণ মানুষকে ইসলামই শিখিয়েছে। (চলবে)

জুমার খুতবা

হারাম শরীফে জুমার খুতবা

বিষয়: ন্যায় ও ইনসাফের প্রকৃত মানদণ্ড

খতীব : শায়খ সউদ আশ-শুরাইম

নিশ্চয়ই সকল প্রসংশা আল্লাহর । আমরা তাঁর প্রসংশা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আর আমরা তাঁর কাছে আমাদের নফসের ক্ষতি এবং কাজের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর যাকে পথভ্রান্ত করেন, তাকে সঠিক পথের দিশা দানকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ দিচ্ছি , আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশিদার নেই। আমি আরো সাক্ষ দিচ্ছি , মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ঠিক যেভাবে ভয় করা উচিত্ সেভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। ” [আল ইমরান : ১০২]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : “হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করে থাক এবং আত্মীয় -স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। ” [নিসা : ১]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমা দের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। ” [আল আহযাব : ৭০]

হামদ ও সালামের পর

নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণী অধিক সত্য এবং মুহাম্মাদ সা. এর আনিত দ্বীন সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল- নব আবিস্কৃত রীতি-নীতি (যা দ্বীনের অংশ বলে প্রচার করা হয়, অথচ তা দ্বীনের অন্তরভুক্ত নয়)। সকল নব-আবিস্কৃত বিষয়ই বিদআত, আর সকল বিদআতই হল পথভ্রষ্টতা । মুসলমানদের জামাতের সাথে অবস্থান করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য । কেননা আল্লাহর সাহায্য জামাতের উপর থাকে।

সম্মানিত উপস্থিতি !

ন্যায় -নীতি ও বিচক্ষণতা সকল ন্যায়পরায়ন ও ইনসাফকারী মুমিনের কাঙ্ক্ষিত বস্তু । আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বান্দাগণ তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে থাকে, তাঁর সৃষ্টিজীবের সন্তুষ্টি নয় এবং সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছে সঠিক পথের দিশা চায়। কেননা তিনিই একমাত্র সত্যের দিকে পথ প্রদর্শনকারী । এ মর্মে তিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন : “আল্লাহই সত্য -সঠিক পথ পদর্শন করেন, সুতরাং যে লোক সঠিক পথ দেখাবে; তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না; তাকে পথ দেখানো কর্তব্য । অতএব তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার?” [ইউনূস : ৩৫]

সত্যবাদী মুমিনদের কাছে আল্লাহর বর্ণিত বিধানই হল ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড এবং অনুসরণ ও অনুকরণের মাপকাঠি। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাদের এ দাবীর বিবরণ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন : “(মুমিন বান্দা গণ বলে) হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা আপনি নাযিল করেছেন, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভূক্ত করে নিন। ” [আল ইমরান : ৫৩]

আয়াতে আলোচিত লোকটিই অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন মুমিন। যার অন্তর সত্যবাদী মুমিন বান্দাদের অন্তরের ন্যায় আল্লাহর নূর অবলোকন করতে থাকে। ফলে চোখ ধাঁধানো ছায়ামূর্তি কিংবা মরিচিকায় তার দৃষ্টিভ্রম ঘটে না। সংখ্যার বিবেচনায় কম-বেশীকে প্রাধান্য

দেয় না। এমনকি সত্যের মঞ্চে দাড়িয়ে সংখ্যাধিক্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। বরং ‘আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন' একথা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করতঃ তার রবের ইবাদত এমনভাবে করে, যেন সেও তাঁকে দেখছে। আর বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই যে কাজ সম্পর্কে মুমিনের অন্তরে খটকা লাগে এবং তা বাস্তবায়ন করা অপছন্দনীয় মনে হয়, তাই ‘গুনাহ বা অন্যায় কাজ'। অতঃপর সে তা পরিহার করে চলে।

আল্লাহ তাআলা হলেন সুনিশ্চিত ইলম, প্রকৃত সত্য ও অকাট্য জ্ঞানের আধার। তিনি এ ধরনের লোকদেরকেই দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করে থাকেন। কারণ, এসব লোকের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রত হয়, কিয়ামত দিবসে তাদের সংখ্যাধি ক্যতা তাঁর কাছে কোন কাজে আসবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: “যখন তোমরা কুফুরী করছিলে, তখন তোমাদের আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। ” [আয যুখরফ : ৩৯]। অথচ অনেকে মনে করে, ‘সংখ্যায় বেশী হওয়া' ন্যায় ও ইনসাফের মানদণ্ড । আর ‘সংখ্যায় কম হওয়া' অন্যা য় কাজে জড়িত হওয়া কিংবা সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ। বস্তুতঃ এটা বিবেকপ্রসূত ধারণা। বরং সত্য যদিও সামান্য হয়; তার অনুকরণ করা উচিত। নিজ প্রমাণ ও দলীলের আলোকে এটাই অসামান্য । কারণ, সত্য কখনো তার অনুগতদের সংখ্যানুপাতে বিবেচ্য নয়। অর্থা সত্যকে মানুষের আধিক্যের সাথে পরিমাপ করা হয় না বরং মানুষকে পরিমাপ করা হয় সত্য দ্বারা । ফলে ‘সংখ্যাধিক্যতা ' কোন সত্যকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না এবং ‘সংখ্যায় স্বল্পতা ' কোন সত্যকে তার স্থান থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও বিচ্যুত করতে পারে না। এ প্রসংঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। ” [আল আনআম: ১১৬]।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন : “আমার সামনে অনেক উম্মতকে উপস্থিত করা হয়, যাদের মধ্যে কোন নবী একজন উম্মাত নিয়ে; কোন নবী দু'জন উম্মতকে নিয়ে; কোন নবী একদল উম্মতকে নিয়ে পথ চলছেন। আবার কোন নবী এমন আছেন, যার সাথে কোন উম্মত নেই। ” বুখারী

তাঁরা এমন নবী আ. ছিলেন, যাদের মধ্যে কেউ কিছু সংখ্যক উম্মত নিয়ে এসেছিলেন। আবার কারো কোন উম্মতও ছিলনা। অথচ কোন কোন নবী নিজ কওমে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। " [হুদ : ৪০] এ স্বল্পতা তাদের নবুওয়াত ও রিসালাতের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি সৃষ্টি করেনি- যেমন, নবীদের মোকাবেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক থাকা স্বত্বেও তাদের (কাফেরদের) সত্যতার উপর প্রমাণ বহন করে না। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফিরআউন ও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারিদের সম্পর্কে আয়াতটি উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দিবে। আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট স্থান , যেখানে তারা পৌঁছেছে। " [হুদ : ৯৮]

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য ! যারা আল্লাহর ব্যাপারে অবহেলা করে এবং তার বিধি-বিধান পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে, কিয়ামত দিবসে তারাই একথার স্বীকৃতি দিবে যে, অধিকাংশ মানুষ যেরূপই করেছিল অথবা যেমন বলেছিল কিংবা যে আক্বীদা -বিশ্বাস পোষণ করেছিল, আমরা তাদেরই অনুসরণ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদের মানদণ্ড ছিল, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরাই সত্যের ধারক বাহক'। অথচ এর কোন দলীল নেই, নেই কোন যৌক্তিকতাও । এধরণের বক্তব্য মূলতঃ ফিরআউন কিংবা তার দোসররাই করে থাকে, যা আল্লা হ তাআলা বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি এ ধরণের দাবী বাতিলকল্পে ইরশাদ করেন : (যখন মূসা আ. তার সাথীসহ ফিরআউনকে তার সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দেন, তখন ফিরআউন তাকে বলল) "তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?" [ত্বহা : ৫১]। অর্থা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে সংখ্যাধিক্য লোকদের অবস্থা কি? তারাও কি ভ্রান্ত পথে ছিল আর তুমিই একমাত্র সঠিক পথে আছ? সে আরো বলল : "হে মূসা ! তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করার জন্য আগমন করেছো ?" [ত্বহা : ৫৭]

নিশ্চয়ই যার কাজ-কর্ম এরূপ; সে প্রকৃতার্থেই নির্বোধ ও মূল্যহীন এবং এমনই অনভিজ্ঞ যে, নিজের নেতৃত্ব তথা স্বাধীনতা অন্যের (হিদায়াত বঞ্চিত) কাছে সমর্পণ করে। সে নিজের দৃষ্টিকে পরিমাণের উপর নিক্ষেপ করে, বাস্তবতার ওপর নয়। এধরণের লোক সম্পর্কে ইবনে মাসউদ রা. বলেন : "তোমাদের কেউ যেন এমন সুযোগবাদী না হয়, যে বলে : যদি লোকেরা

সুপথপ্রাপ ্ত হয় তবে আমিও সুপথপ্রাপ্ত আর যদি তারা পথভ্রান্ত হয় তবে আমিও পথভ্রান্ত । জেনে রাখ, তোমাদের কেউ যেন নিজেকে এমনভাবে তৈরী না করে যে, যদি লোকেরা কুফরী করে তাহলে সেও কুফরী করে বসবে। " ইবনে কুতাইবাহ র. একটি উত্তম উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন : "মানুষ হল পাখির ঝাঁকের ন্যায় ; একদল অপর দলের অনুগামী হয়। 'রাসূলুল্লাহ সা. সর্বশেষ নবী' এ কথা জানা স্বত্বেও যদি কারো কাছে এ সংবাদ আসে যে, একজন নিজেকে 'নবী' বলে দাবী করেছে অথবা 'রব' বলে দাবী করেছে, এমতাবস্থায়ও এ মিথ্যাদাবীদারদের অনুসারী ও অনুগামী পাওয়া যাবে। "

সুতরাং প্রকৃত সত্যবাদী মুমিন তারাই, যাদেরকে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধোকা দিতে পারেনা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ !

যদি আমরা আমাদের পবিত্র কুরআনের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাব, যেগুলোতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দ্বীনী বিষয়াবলীর সত্যতা নির্ধারণ ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এমন কোন মানদণ্ড নয় যার উপর নির্ভর করে কোন বিধান আরোপ করা যায় কিংবা তা অনুকরণ করা যায়। যেমন-

ঈমান প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসী নয়। " [ইউসূফ : ১০৩]

হক্ব ও তা গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "আমি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম পাঠিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্ম গ্রহণে নিস্পৃহ। " [আয যুখরুফ : ৭৮]

জিহাদ ও প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দলবল, তা যতই বেশী হোক । জেনে রেখ! আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদ ারদেরসাথে। " [আল আনফাল : ১৯]

তিনি আরো ইরশাদ করেন : "হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। " [আত তাওবা : ২৫]

কৃতজ্ঞতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : "হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ । " [আস সাবা : ১৩]

আর্থিক লেনদেন প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি যুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও স কর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প ” [আছ ছোয়াদ : ২৪]

সঠিক আক্বীদা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরক করে। ” [ইউসূফ : ১০৬]

ওয়ায ও নসীহত প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন , কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। [আশ শুআরা: ৮-৯]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছে; একথা প্রমাণ করার জন্য যে, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা ' কোন গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নয়। অপরদিকে ‘সংখ্যালগিষ্ঠতা ' কে ইসলাম কখনো তুচ্ছজ্ঞান করেনি। বরং বিভিন্ন স্থানে এর প্রশংসা করেছে। এমনকি আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সংখ্যালগিষ্ঠ দলের প্রশংসা করে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে মুমিন! যদিও তুমি একাকী কিন্তু ঈমানের নেসবতে তুমিই অনেক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক , সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। ” [আন নাহল : ১২০]

ঈমান প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে। ” [আল ওয়াক্বিয়া : ১৩-১৪]

জিহাদ ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : “সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল , আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। ” [আল বাক্বারা : ২৪৯]

উপরোক্ত প্রমাণাদীর সারমর্ম হল, ‘সংখ্যাধিক্য ' সত্য নির্ণয়ের কোন মানদণ্ড নয় এমনকি মানুষকে প্রকৃত মূল্য প্রদানেরও মাধ্যম নয়।

সম্মানিত উপস্থিতি !

ইসলাম কখনো কখনো ‘সংখ্যালগিষ্ঠতা 'র প্রশংসা করেছে, আবার কখনো ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'র প্রশংসা করেছে। যখন এ গরিষ্ঠতা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য সীমাতিক্রম না করে। বরং আল্লাহ তাআলা এর কা´িখতস্থান যেমন- আল্লাহর রাস্তা , গরীব, মিসকীন, এয়াতীম ও মুসাফিরদের জন্য অধিক সম্পদ খরচ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর প্রশংসা করেছেন। তবে ব্যাপকভাবে সংখ্যাধিক্যের পিছনে তাড়িত হওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং কা´িখতস্থান ছাড়া সর্বত্র তা বর্জন করাই উত্তম। এর স্বপক্ষে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য তা হল- মুরতাদদের হত্যার ব্যাপারে হযরত আবু বকর রা. এর সিদ্ধান্ত । এক্ষেত্রে তিনি একক ব্যক্তি ছিলেন অথচ তার সিদ্ধান্ত সত্য ও সঠিক হওয়ায় সংখ্যাধিক্যের স্থান অধিকার করেছিল। অনুরূপ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল র. সিদ্ধান্ত । তিনি কুরআন মাখলুক' বিষয়ক ফেতনার সময় এককভাবে হক্কের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ফলে তার সিদ্ধান্তই সংখ্যাধিক্যের স্থান লাভ করেছিল।

অতএব, আমাদেরকে উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ শিক্ষা লাভ করতে হবে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা ' কোন মানদণ্ড নয়। বরং প্রকৃত মানদণ্ড হল আল্লাহর বিধান।

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের বরকত দান করুন। এর আয়াত, উপদেশ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। আমি যা বলেছি, সঠিক হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছি। আর ভুল হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে বলেছি। আমি সকলের জন্য ও নিজের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ।

২০/১০/১৪৩৩

অনুবাদ : সুলতান মাহমুদুর রহমান

মুসলিম বিশ্বের খবর

রাসূল সাঃ-এর অবমাননা
বিশ্বজুড়ে মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ

মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে অবমাননকারী চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রত িবাদেবিশ্বব্যাপী মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। পাকিস্তানে বিক্ষোভের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ২০ জন নিহত হয়েছেন। লেবাননে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে দেশটির ইসলামপন্থীসংগঠন হিজবুল্লাহ । চলচ্চিত্রটির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ অব্যাহ ত রয়েছে। পাকিস্তানের গত ২১ সেপ্টেম্বর এক দিনের প্রতিবাদ বিক্ষোভকালে ২০ জন নিহত হয়। বিক্ষুব্ধ জনতা সিনেমাহলে আগুন দিয়েছে, সরকারি অফিসগুলোও আক্রান্ত হয়েছে। পেশোয়ারে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের সময় একজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। করাচিতে মার্কিন কনস্যু লেট অফিসের বাইরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছে। আফগান রাজধানী কাবুলে কয়েক হাজার লোক বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেন, পুলিশের গাড়ি পুড়িয়ে দেন। এক বিক্ষোভকারী বলেন, ‘আমরা আমাদের নবীরজন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যাবো । আমরা তাকে অপমানিত হতে দেবো না। তাকে অসম্মান করার কারণে আমেরিকানদের মূল্য দিতে হবে। সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে লিবিয়ায়। সেখানে বিক্ষোভকারীদের হামলার ঘটনায় লিবিয়ায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ কয়েকজন নিহত হয়। এছাড়া মিসর, তিউনিসিয়া, ফিলিস্তিন , বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া , মালয়েশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান , বাংলাদেশ, কাশ্মীরসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়।

মিসরে ১৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে কাতার

কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হামাদ বিন হাসেম বলেছেন, মিসরের অর্থনীতি চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে তার দেশ আগামী পাঁচ বছরে মিসরে ১৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। গতবছর গণবিক্ষোভের পর থেকে দেশটির অর্থনীতি চাপের মধ্যে রয়েছে। গত ৬ সেপ্টেম্বর মিসরের সরকারি সংবাদ সংস্থা মেনাকে তিনি বলেন, দোহা বেশি অর্থ মিসরে বিনিয়োগ করবে। মিসরের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির সাথে আলোচনার পর তিনি বলেন, কাতার প্রধানত বিদ্যু , প্রাকৃতিক গ্যাস ও পর্যটন খাতে বিনিয়োগ করবে। কাতার গত মাসে মিসরকে দুই বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয়ার ঘোষণা দেয়। প্রথম পর্যায়ে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে। মিসরের প্রধানমন্ত্রী হিশাম কান্দিল বলেন, বাকি অর্থ সেপ্টেম্বর , অক্টোবর ও নভেম্বরে হস্তান্তর করা হবে। ২০১১ সালের ফেব্র “য়ারিতে মোবারকের উ খাতের পর থেকে মিসরের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মজুদ দ্রুত কমে যাচ্ছে ।

ইরানে হামলা চালালে মধ্যপ্রাচ্যে মহাপ্রলয় ঘটবেঃ এরদুয়ান

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়্যেব এরদুয়ান কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল ইরান প্রজাতন্ত্রে হামলা চালালে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে 'মহাপ্রলয় ' ঘটবে। আমেরিকান টেলিভিশন চ্যানেল সিএনএসকে দেয়া এক সাক্ষা কারে ওই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের এই নেতা। ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোতে ইসরাইল সর্বা িক হামলা চালাতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন েরজবাবে এরদুয়ান বলেন, 'ইসরাইল ইরানে হামলা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ ধরনের আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ । কারণ তেমন কিছু ঘটলে গোটা অঞ্চলে এক মহাধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবে। ' তুর্কি প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের কিছু ঘটুক তা আমরা অবশ্যই চাই না। চলমান সময়ে আমাদের এ অঞ্চলে শান্তি , সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা দরকার। ' বহুদিন ধরে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোতে হামলার হুমকি দিয়ে আসছে ইসরাইল। তেহরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে বলে তেলআবিব অভিযোগ করে এলেও ইরান বলছে, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তার পরমাণু কর্মসূচি পরিচালিত্তচ্ছে । তবে ইসরাইলের যে কোন হামলার ধ্বংসা িক জবাব দেয়া হবে বলে বার বার ঘোষণা করেছে ইরান।

আবার গাজা দখল করতে পারে ইসরাইলঃ এহুদ বারাক

ইসরাইলের যুদ্ধমন্ত্রী এহুদ বারাক বলেছেন, ভবিষ্যতে তেলআবিব ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার অংশবিশেষ আবারো দখলে নিতে পারে। অপারেশন কাস্ট লিড' নিয়ে দেশটির ফিশার ইনস্টিটিউটের সাথে বৈঠকে তিনি এ ঘোষণা দেন। ২০০৯ সালে অপারেশন কাস্ট লিড বন্ধ হওয়ার পর থেকে ইসরাইল বহুবার অবরুদ্ধ গাজা উপত্যাকায় ট্যাংক ও বিমান হামলা চালিয়েছে। ২০০৮-০৯ সালের শীতকালে গাজা উপত্যকায় তিন সপ্তাহব্যাপী ভূমি, আকাশ ও নৌপথে হামলা চালায় ইসরাইল। ত্রিমুখী এসব হামলায় এক হাজার ৪০০ ফিলিস্তিনি শহীদ হন। এ ছাড়া এই আগ্রাসনে গাজা উপত্যকায় ১৬০ কোটি ডলার মূল্যের আর্থিক ক্ষতি হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর ইসরাইলি ট্যাংক হামলায় গাজার উত্তরাঞ্চলীয় শহর বেইত হানুনে তিনজন ও তার আগের দিন মধ্য গাজায় বিমান হামলায় আরো তিন ফিলিস্তিনি শহীদ হন।

সোমালিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ

সোমালিয়ার পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে হাসান শেখ মোহাম্মদ দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। মোগাদিসু থেকে সরকারি ফলাফলের ভিত্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। প্রথম দফার ভোটে বর্তমান প্রেসিডেন্ট শেখ শরিফ আহমদ প্রথম ও মোহাম্মদ দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় মোহাম্মদ ৫০ শতাংশ ভোট লাভের নিয়মে উত্তীর্ণ হন

এবং ১৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। অন্যদিকে শেখ শরিফ ৭৯টি ভোট পান। মোগাদিসু থেকে আলজাজিরার নাজানিন মোশাহরি জানিয়েছেন, এখানকার জনগণ আমাকে জানিয়েছেন, তারা পরিবর্তন চান ও নতুন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন। মনে হচ্ছে তারা তাকে পেয়েছেন। সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দেওয়ালিও রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি তৃতীয় হন। মনে করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকেরাই বিরোধী প্রার্থী শেখ মোহাম্মদকে সমর্থ ন দিয়েছিলেন এবং তাকে বিজয়ী করেন।

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৪ জুন

ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য আগামী ১৪ জুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইরানের সরকারি বার্তাসংস্থা ইরনার প্রতিবেদনে এ খবর জানানো হয়েছে গত ৭ সেপ্টেম্বর । ইরনার প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় প্রেসিডেন্ট ও পৌর নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আহমাদিনেজাদ ও তার রক্ষণশীল প্রতিদ্বন্দি ীর মধ্যে লড়াই হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে । আহমাদিনেজাদ এরপর আর নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। গত মার্চের সংসদ নির্বা চনে আহমাদিনেজাদের সমর্থিত প্রার্থীরা বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

কাশ্মির ইস্যুতে কোন আপস মানব না- ইমরান খান

পাকিস্তানের ক্রিকেট অধিনায়ক ও তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান ইমরান খান বলেছেন, ভারতের সাথে আলোচনাকে সমর্থন করি কিন্তু কাশ্মির ইস্যুতে কোনো ধরনের আপস মেনে নেয়া হবে না। ভারতের সাথে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) শান্তি আলোচনার উদ্যোগকে ইমরান খান ভালো বলে স্বাগত জানিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণার পাকিস্তান সফরের পর ইমরান খান এসব কথা বললেন। এবারের সফরের সময় কৃষ্ণা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা ভিসা জটিলতা নিরসনে চুক্তি করেছেন। দুই দেশই এ চুক্তিকে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১ বছর পর মিসরের বিমানে হিজাবধারী বিমানবালা

মিসরের চ্যালেনগুলোতে হিজাব নিষিদ্ধ আইন বাতিলের পর এবার বিমানবালাদের হিজাব পরিধানে নিষেধাজ্ঞা আইন বাতিল করছে বিমান মন্ত্রণালয় । বিমানমন্ত্রী সামির ইমবারী হিসাব নিষিদ্ধ আইন বাতিল করে সরকারি তত্বাবধানে হিজাবধারী বিমানবালা চালুর নির্দেশ জারি করেন। ৩১ বছর পর এই হিজাব পরার অনুমতি পেল বিমানবালারা। ফলে কিছু বিমানবালা গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকেই হিজাব পরিধান করে দায়িত্ব পালন করেন। ১৭২ জন বিমানবালা হিজাব পরিধান করে কাজ করছে বলে জানান, বিমানসচিব রাজদি জাকারিয়া। তিনি আরো বলেন, সারা

বিশ্বের কাছে মিসরের বিপ্লব সফল ও স্বার্থক হয়েছে। মিডিয়াকর্মীদের মতো বিমানের ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যই আইনটি বাতিল করা হয়েছে। বিমান কর্মকর্তা মাহমুদ খাইরি বলেন, বিমানবালাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার তাদের ওপর থেকে হিজাব নিষিদ্ধ আইন তুলে নিয়েছে। নতুন নিয়োগ নয় বরং আগের বিমানবালারাই হিজাব পরে প্রতিদিন শতাধিক বিমানে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। **সংগ্রহে :আহমদ রাফিদ ফারহান**

তারুণ্য

এলো ঈদুল আযহা – দিলো ত্যাগের তাগিদ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা । প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয় ইসলাম। এ বিশ্বে সকল মানুষকে একত্রিত করতে অন্যতম একটি গুণ হলো আত্মত্যাগ । আর এ আত্মত্যাগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে ঈদুল আযহায়।

বছর ঘুরে আবারো সকল মুসলিম জনতাকে ভ্রাতৃত্বে বন্ধনে আবদ্ধ করতে চলে এসেছে ঈদুল আযহা। ঈদুল আযহা'র নেপথ্য কাহিনী আমরা সকলেই জানি- কিন্তু সেই শিক্ষা কতটুকু প্রয়োগ করছি জীবনে? ভেবে দেখা হয়েছে কি? একজনের জন্য অন্যকে ছাড় দিতে হয়- এ শিক্ষা আমরা পেয়েছি কি? প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান। প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি - এ বিষয়টি জীবনে মেনে চলি কি? যদি উত্তর হয় হ্যাঁ , তবে আলহামদুলিল্লাহ । আর যদি উত্তর না হয়, তবে তা হ্যাঁ তে রূপান্তরিত করার সময় এসেছে।

বন্ধুরা জীবনের সব শিক্ষা আমরা গুরুজনদের কাছে পেয়ে থাকি সত্য। কিন্তু যদি আমাদের জীবনেও তেমন সুযোগ আসে যে আমরাও তাদের শেখাতে পারি, তবে কি আমরা তা করবনা? অবশ্যই করব আর তাই এবারের ঈদুল আযহা হয়ে উঠুক অনন্য। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যুক্ত করে একটি বৃহত্ পদক্ষেপ সৃষ্টি হতে পারে। বদলে দাও সকলের নোংরা প্রতিযোগিতাকে । কার চেয়ে কে বেশি ধনী কার কোরবানীর পশুটা বড় এ কি একজন মুসলিমের জন্য আলোচ্য হতে পারে? তোমরাই পারো এ চেতনাকে মুছে কল্যাণ চেতনায় সকলকে জাগ্রত করতে। সবাইকে জানাও এবং বোঝাও কোরবানীর মূল লক্ষ্য । অন্যের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া শেখো । তবেই না সার্থক হবে তোমার দান। পূর্ণ হবে তোমার ধর্ম । তবে এ শিক্ষাই হোক আমাদের এবারের প্রচেষ্টা - বন্ধুরা মনে রেখো আজকের তোমরাই আগামীর ভবিষ্যত্ । বেলী ফারহানা

ক্যারিয়ার গাইড

হতে পারেন মার্চেন্ডাইজার

বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানী আয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আসে পোশাক শিল্প থেকে। এ ক্ষেত্রে যে শুধু অশিক্ষিত , অর্ধশিক্ষিত বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরই কর্মসংস্থান হয়েছে তা নয়। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের জন্যও শিল্প বয়ে এনেছে সুবর্ণ সুযোগ । মার্চেন্ডাইজার হয়ে যে কেউ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত হতে পারেন। এ পেশায় ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন কোন মার্চেন্ডাইজারের মাসিক বেতন হতে পারে কমপক্ষে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। যা যোগ্যতা অনুযায়ী এক থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্রীলংকা , ভারত ও পাকিস্তান এগিয়ে রয়েছে। এ পেশায় জড়িত ওই দেশের নাগরিকরা মাসিক বেতন হিসেবে দুই থেকে ছয় হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত আয় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা মোটা অঙ্কের বেতনে নিজেকে এ পেশায় ওই বিদেশীদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারে অনায়াসে। স্নাতক , স্নাতকোত্তর বা সমমানের যে কোনো ডিগ্রিধারী এ পেশায় প্রশিক্ষণ নিয়ে আধুনিক ও স্মার্ট ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান । ভাল প্রতিষ্ঠান দেখে ভর্তি হতে হবে। নকিব

প্রতিবেদন

মসজিদ কাউন্সিলের মাধ্যমে যাকাতের টাকায় স্বাবলম্বী হচ্ছেন সালমা বেগম

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার একটি গ্রাম পশ্চিম চরতিল্লী । এ গ্রামেই বাস করেন সালমা বেগম, যার বয়স ৩৩ বছর এবং তার স্বামীর নাম মো : লাল মিয়া। ৩ বছর আগেও তিনি ছিলেন তার এলাকার মধ্যে একজন হত-দরিদ্র মানুষ। সম্পদ বলতে স্বামীর পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বসত ভিটা ও ৬ শতক কৃষি জমি। পারিবারিক ভাবেই তিনি হত-দরিদ্র । সালমার স্বামী পেশা হিসেবে বেছে নেন মাটি কাটারকাজ। তাও আবার দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে । এটাই তার স্বামীর একমাত্র পেশা। সালমা নিজের ঘর সংসারের কাজ করেন। স্বামীর একার আয় দিয়ে ৫ জনের সংসার কোনমতে দ'বেলা খেয়ে না খেয়ে চলতে থাকে। অধিক আয়ের আশায় আমার স্বামী বিদেশ যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। লাল মিয়া চড়া সুদে এলাকার এনজিও ও মহাজনের নিকট থেকে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে পাড়ি দেয় লিবিয়ায়। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর পাঠানো টাকায় সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসে। পরিশোধ করতে থাকেন সুদের কিস্তি । ৬-৭ মাস যেতে না যেতেই পরিবারে নেমে আসে চরম বিপত্তি । লিবিয়ায় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় চাকুরী হারান স্বামী লাল মিয়া। একপর্যায়ে যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ঋণের বোঝা অন্য দিকে স্বামী চিন্তা । সেইসাথে তিন ছেলে নিয়ে সংসার চালানো । সুদী মহাজন ও এনজিওদের আনাগোনা বেড়ে যায়। একপর্যায়ে অসহায় হয়ে পড়েন সালমা বেগম। এমন সময় এলাকায় শুরু হয় মসজিদ কাউন্সিল পরিচালিত যাকাত ভিত্তিক হাসানা প্রকল্পের কার্যক্রম ।

যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মসজিদ কাউন্সিল আর এ কর্মসূচীর নাম হাসানা। মসজিদকেন্দ্রিক ৩০ থেকে ৩৫টি পরিবারের সমন্বয়ে গঠন করা হয় একেকটি গ্রাম সংগঠন বা সমিতি যার নাম দেয়া হয়েছে হাসানা। বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলার সদর ও সাটুরিয়া উপজেলার প্রায় ১০৩১টি দরিদ্র ও অতি পরিবারের সময়ে গঠন করা হয়েছে এ রকম ৩৩টি গ্রাম সংগঠন বা হাসানা গ্রুপ। এসব হাসানা গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে চারটি হাসানা অঞ্চলের তত্বাবধানে ।

এমনই একটি হাসানা গ্রুপের সদস্য সালমা বেগম। এ হাসানা গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৩০ জন যা ছয়টি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত । প্রতিটি ক্ষুদ্র দল থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে গঠন করা হয় ছয় সদস্যের হাসানা গ্রুপ পরিচালনার জন্য একটি নির্বাহী কমিটি। যাকাতের টাকার মালিকানা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি হাসানা গ্রুপের নামে পৃথক ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়। এ সকল অ্যাকাউন্ট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হাসানা গ্রুপের সভাপতি, সেক্রেটারী ও মসজিদ কাউন্সিলের প্রতিনিধি । ওই অ্যাকাউন্টে মসজিদ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এককালীন জমা করা হয় জনপ্রতি ১৫,০০০/- টাকা হিসেবে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজারটাকা। এ টাকার পূর্ণ এবং সমান মালিকানা দেয়া হয় সমিতির ৩০ সদস্যকে । ইতোমধ্যে প্রতিটি সদস্যকেই তার চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করা হয় এবং প্রশিক্ষণের পর সদস্যরা নিজেদের ইচ্ছে মতো নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগ করতে থাকেন এ টাকা।

মসজিদ কাউন্সিলের মাঠকর্মীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে সালমা বেগম গরুপালনে প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠেন আত্মপ্রত্যয়ী । স্বপ্ন দেখেন নতুন জীবনের। ১৬ মে ২০১০ তারিখে হাসানা গ্রুপ থেকে বিশ হাজার আটশতটাকায় একটি ষাড় গরু বিনিয়োগ নিয়ে এক মাস পরেই তা তিন হাজার টাকা লাভে বিক্রি করেন। যা ছিল সালমা বেগমের প্রথম বড় অংকের আয়। প্রথম আয়ের মুখ দেখে আরও বেশি আত্মিবশ্বাসী হয়ে ওঠেন সালমা। এভাবেই অক্টোবর ২০১০ থেকে নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সময়ে তিন দফায় হাসানা গ্রুপ হতে তেষট্টি হাজার টাকার বিনিয়োগ সুবিধা নিয়ে গরু মোটাতাজা করণ ও একটি গাভী পালন করে ঋণ পরিশোধসহ সংসারের প্রতিদিনেরখরচ মিটিয়ে চলতে থাকেন। এরই মধ্যে লালমিয়া হঠা একদিন দেশে ফিরে আসেন শূন্য হাতে। শত হতাশার মাঝে লালমিয়াকে কাছে পেয়ে তার মনোবল বেড়ে যায় এবং তাকে হাসানা প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জানায়। তখন সালমার পাশাপাশি তার স্বামী লালমিয়াও প্রতিদিন দিনমজুরের কাজ করেএবং সালমাকেও সে সহযোগিতা করে। এ ভাবে তাদের প্রতিদিন আয় হতে থাকে গড়ে ৫০০-৬০০ টাকা অর্থা দু'জনে গড়ে মাসে ১৫-১৬ হাজার টাকা আয় করছেন। গতবৎসর কুরবানীর সময় গরু বিক্রি করে লাভ করেছে ২৫,০০০/- টাকার মতো । বর্তমানে তারা সংসার চালিয়েও প্রতিমাসে প্রায় ৬০০০/- টাকার ঋণ পরিশোধ করছেন। এ ছাড়া হাসানা গ্রুপেও বাড়ছে তার সম্পদের পরিমাণ। এ ভাবে চলতে থাকলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে দায়-দেনা পরিশোধ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবেন সালমা বেগম। আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি সাপ্তাহিক হাসানা মিটিং ও জীবন ঘনিষ্ট শিক্ষা কেন্দ্র হতে সালমার পরিবারের সকলেই নামাজ শিক্ষা , পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা , সামাজিক আচার ব্যবহারসহ জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয় সর্ম্পকেও জানতে পারছেন এবং তার পরিপালনের চেষ্টা করছেন। সালমার এক ছেলে ৭ম শ্রেণীতে ও এক ছেলে ২য় শ্রেণীতে পড়ছে ও নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। এ

ছাড়াও ফেরদৌসী স্বাস ্থ্যকেন্দ্রে এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে তারা বিনা খরচে নিয়মিত চিকিৎসা সেবাও পেয়ে থাকে।

সালমা জানান, এখন আমি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি, আমাকে এখন আর অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়না। আশা করছি সুস্থ থেকে কাজ করতে পারলে এবং হাসানা থেকে সহযোগিতা নিয়ে এভাবে আয় বর্ধনমূলক কাজে লাগাতে পারলে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে আমার পরিবারটি একটি স্বচ্ছল পরিবারে পরিণত হবে ইন্শাআল্লাহ । সালমার মতো এলাকায় স্বাবলম্বী হচ্ছেন মো : হুমায়ুন, সেলিম, ফজল, রেহানা বেগমসহ প্রায় তিনশত দশটি পরিবার।

মসজিদ কাউন্সিল পরিচালিত হাসানা প্রকল্পের সহকারি ব্যবস্থাপক লোকমান আহমাদ জানান, প্রাথমিকভাবে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাদিক টাকা দিয়ে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ এলাকায় সুবিধভোগী পরিবারের সংখ্যা ৪৫০টি। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যাকাত, ফিতরা ও সাদাকাহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এ অর্থ । ২০০৯ সালে পাঁচ বছরেরজন্য নেয়া এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, হাসানা পদ্ধতিতে যাকাত গ্রহীতারা নিজেরাই সমিতিবদ্ধ হয়ে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। আমরা কেবল দিকনির্দেশনামূলক সহযোগিতা দিচ্ছি। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের মেয়াদশেষ হয়ে গেলে হাসানা গ্রুপের সদস্যরাই এ প্রকল্পে কার্যক্রম চালু রাখবে এবং মসজিদ কাউন্সিল দুর থেকে তা পর্যবেক্ষণ করবে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এখনো পর্যন্ত কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা ব্যয় মেটানো হচ্ছে। পাঁচ বছর শেষে তারা চাইলে আমাদের সহযোগি তা নিতে পারেন, নয়তো নিজেরাই নিজেদের মতো সমিতি পরিচালনা করতে পারেন। প্রতিটি হাসানা গ্রুপই হয়ে উঠেছে একটি স্ব -উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান । যাকাতের টাকায় পরিচালিত হাসানা মডেল সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে কয়েক বছরের মধ্যে যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ ।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা

ডা: মো : মোয়াজ্জেম হোসেন এফআরসিপি

সম্প্রতি ডেঙ্গু ভাইরাস সর্বত্র বেশ সরস আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে এইসব অতিমাত্রায় মাতামাতিতে চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। তাই জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কলম ধরতে হল।

প্রথম জানা দরকার ডেঙ্গু কি?

ডেঙ্গু ভাইরাস ফ্লেভিভাইরাস গ্রুপের সদস্য এক ধরনের আর.এন.এ ভাইরাস। এই ভাইরাস সাধারণত ট্রপিক্যাল ও সাব ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। তবে দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়া অঞ্চলকেই এর এন্ডেমিক বা অধিকমাত্রায় সংক্রমণ অঞ্চল হিসাবে ধরা হয়।

কি দিয়ে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ায়?

আমরা জানি ডেঙ্গু ভাইরাস সারাবিশ্বে ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। তবে এশিয়া, ফিলিপাইন ও জাপানে এডিস এজিপটির পাশাপাশি এডিস এলবোপিকটাস ছাড়াও ডেঙ্গ ছড়িয়ে থাকে। এইসব মশা সাধারণত কোন ডেঙ্গু রোগীকে কামড়ানোর ৮ থেকে ১১ দিনের মধ্যে সংক্রমণে পরিণতহয় এবং একবার সংক্রামক হলে সারাজীবন রোগ আক্রমণ করে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ঐ সংক্রামক মশার ভবিষ্য , প্রজন্মও এই রোগের সংক্রামক হয়েই জন্মাবে । সংক্রমিত মশার কামড়ের পর এই ভাইরাস প্রথম আশপাশের লশিকা গ্রন্থিতে চলে যায়। সেখান থেকে লশিকা তন্ত্রে গিয়ে বিস্তার লাভ করে এবং রক্তে ছড়িয়ে পড়ে।

কিভাবে ডেঙ্গু বোঝা যাবে?

সুপ্ত অবস্থা সাধারণত ২-৭ দিন হয়ে থাকে। ডেঙ্গু সাধারণত স্বল্প সময়ের ভাইরাল ফিভার হিসাবেই পরিচিত। আক্রান্ত রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে যদি না মারাÍক ভাইরাল হিমোরেজিক ফিভারে রূপান্তরিত না হয়ে থাকে।

ডেঙ্গুর লক্ষণসমূহঃ

হঠা উষ্ণ তাপমাত্রার (৪০০প) দ্বিস্তরের জ্বর হয়ে থাকে। মাংস পেশীর মারাত্মক ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকে, এই জন্য ডেঙ্গুকে ব্রেকবোন ফিভারও বলা হয়ে থাকে। খুব মাথা ব্যথা হবে। আপার রেসপিরেটারি সিম্পটম তথা হাঁচি, কাশি ইত্যাদ িহতে পারে। জ্বর কয়েকদিন পর স্বল্প সময়ের বিরতিতে আবার দেখা দেয়। এই সময়ে ৩য় থেকে ৫ম দিনের মধ্যে এক ধরনের লালচে রেশ প্রথমে শরীরে, পরে হাত-পা ও মুখে ছড়িয়ে পড়ে। রেশ দেখা দেয়ার কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর পড়তে শুরু করে এবং রোগী ক্রমে আরোগ্য লাভ করে।

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসাঃ

কোন ভাইরোলজী ল্যাবরেটরিতে ডেঙ্গ ভাইরাস আইসোলেশন বা এন্টিবডি টাইটারের ক্রমবর্ধন নির্ণয় করাই একমাত্র উপায়। রোগের স্পেসিফিক কোন চিকিৎসা সেই। তবে রোগের চিকিৎসা বলতে মূলত উপসর্গের চিকিৎসাকেই বুঝায়।

রোগের জটিলতাঃ

এনকেফা লাইটিস ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার (DHF)

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকারঃ দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়াতে বাচ্চারাই মূলত এই রোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত (Morbidity & Morialit) হয়ে থাকে। কেন ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে (DHF) হয়ে থাকে তার সঠিক কারণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব নহলেও ডেঙ্গুর অস্বাভাবিক স্তর বিন্যাসকেই অদ্যাবধি স্বতঃসিদ্ধ কারণ হিসাবে ধরে নেয়া হচ্ছে ।

কিভাবে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার ক্ষতি সাধন করে থাকে?

এক. ডেঙ্গ ভাইরাস শরীরের ছোট ছোট রক্ত সঞ্চালন নালী (Capillary)গুলোর প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে এবং তাদের পানি নিঃসরণ (Permia bilit) ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এতে করে রক্তের ঘনত্ব Hacmoconcentration বেড়ে যায়, রক্তের পরিমাণ হ্রাস পায় (Hypovolaemia), টিসু পারফিউশান ও অক্সিজেনেশান হ্রাস পায় Reduced tissue Perfusion & Oxygenatuion) এসিডোসিস (Acidosis) এবং অত্যধিক মাত্রায় কোষ ধ্বং স (Widespread cellular damage) হয়ে রোগী (Shock) সকে চলে যায়।

দুইঃ এন্টিজেন -এন্ডিবডি কমপ্লেক্সের কারণে ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কগুলেশন হয়ে থাকে।

তিনঃ লিভার কোষের পচন ধরতে পারে।

চারঃ কিডনীতে প্রদাহ হতে পারে।

পাঁচঃ অস্থি মজ্জায় রক্ত কণিকা তৈরিতে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ছয়ঃ পুরান ও পেরিটোনিয়াল ইফিউশান হতে পারে।

DHF -এরর লক্ষণসমূহ কি কি?

DHF এর প্রথম স্তরের শেষে দিকে রোগীর অবস্থা অতি দ্রুত খারাপ হতে পারে।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলঃ

- রোগী অস্থির হয়ে পড়ে
- রোগী অধিক মাত্রায় ঘামতে থাকে
- রক্তচাপ হ্রাস পায়।

টরনি কোয়েট টেস্ট পজিটিভ হয়, পেটিকি, একই মোসিস ও স্পোন্টেনিয়াস হিমোরেজ হয়ে থাকে। লিভার বড় হতে পারে এবং চাপলে ব্যথা অনুভব হতে পারে। রক্তে প্রোটিন ও সোডিয়ামের পরিমাণ কমে যাবে এবং লিভার এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফ্লটিং ফেক্টর ও ফিব্রি নোজেন কমে যাবে।

রোগের পরিণতিঃ

- চিকিৎসা না করলে শতকরা ৫০ জন এবং চিকিৎসা করলে শতকরা ৫ জন মারা যেতে পারে।
- রোগ নির্ণয় করবেন কিভাবে?
- পজিটিভ টরনিকোরেট টেস্ট। ক্রমাগত রক্ত ক্ষরয় ।
- থ্রোম্বো সাইটোপেনিয়া ।
- হিমোকনচেনট্রেশান ।
- এইগুলোর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা করবেন কিভাবে?

- প্রথম থেকেই রোগীর ফ্লুইড ও ইলেকট্রলাইট ব্যালেন্স মেনটেইন করে যেতে হবে।
- সকের (ঝযড়পশ) ক্ষেত্রে -
- রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে।
- রোগীর পানি স্বল্পতা দূর করতে হবে।
- পানি ও ইলেকট্রলাইট ঘাটতিযাতে না হয়। তারজন্য ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ১০০ মিঃ লিঃ প্রতি কেজি শরীরেরওজনে অথবা ১০-১৫ মিঃ লিঃ রিংগারলেকটেট সোলিউশন প্রতি কেজি শরীরের ওজনে ইন্ট্রাভেনাসলি একঘন্টা যাবত দিতে হবে এবং রিংগারলেকটেট সোলুশানের পরিবর্তে স্বল্পমাত্রায় ইলেক্ট্রোলাইট চালাতে হবে।
- প্লাজমা বা তার সাবসটিটিউট দেয়া যেতে পারে। এই ধরনের অবস্থায় রক্ত দেয়া যাবে না। তবে সক থেকেউদ্ধারের পর রোগীর অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ হলেই কেবলমাত্র ব্লাড ট্রান্সফিউশান দেয়া যেতে পারে। হাইপো ভোলেমিয়ার ক্ষেত্রে -প্লাজমা ১০-২০ প্রতি কেজি শারীরিক ওজনে প্রতি ঘন্টায় দিতে হবে।
- হাইপোটেনসিভ অবস্থায় হাইড্রোকর্টিসন দৈনিক ৫০-১০০ মিঃ রিঃ করে দিতে হবে। বা এলডোস টেরন দৈনিক ১ মিঃ পাঃ প্রতি কেজি শারীরিক ওজনে দিতে হবে। সাথে সাথে আই ভি ফ্লুইড দিয়ে যেতে হবে।
- মেটাবলিন এসিডোসিলের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৩.৭৫% সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ১-২ মিঃ লিঃ প্রতি কেজি শারীরিকক ওজনে প্রতি ১০১৫ মিনিট অন্তর অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত দিয়ে যেতেহবে।

থোম্বোসাইটোপেনিয়ার ক্ষেত্রেঃ

ফ্রেস হিউম্যান প্লাটিলেটকনসেনট্রেট দিতে হবে। কেউ কেউ হেপাবিন ব্যবহারকেও উৎসাহিত করেছেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধঃ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোন ভেরিনেশানতাই। বস্তুত ডেঙ্গুর স্বভাব বৈচিত্র্যই ভেক্সিনেশানের প্রধান অন্তরায় । তবে ডেঙ্গুর প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হল ডেঙ্গু বহন ক্ষম মশা নিধন করা, মশারি ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া ও ঘরের দরজা, জানালায় মাসকিউটো নেট ব্যবহার করা।

এই লেখা ডেঙ্গু বিড়ম্বনা থেকে দেশ ও সমাজকে কিছু মাত্রায় হলেও উতরাতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

চেম্বার : মেডিনোভা , ৫/এ, ধানমন্ডী , ঢাকা।

আপনার জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন - মাওলানা মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

সোহানা বেগম, ঢাকা

প্রশ্ন -১: আমি কিছুদিন ধরে খুব টেনশনে আছি, আজেবাজে চিন্তা মাথায় আসে। রাতে ঘুমোতে পারি না। মনে মনে যা চিন্তা করি মনে হয় সত্যিই বুঝি তা হয়েছে। দয়া করে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি কি বিশেষ কোনো দুআ করবো ?

উত্তর : আপনি বেশি বেশি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাযীম' পড়ন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মত আদায় করুন। যখন আপনার মনে আজে-বাজে চিন্তা আসবে তখন আপনি নিজেকে কুরআন তিলাওয়াত বা হাদীস অধ্যয়নে মগ্ন রাখুন। আপনার টেনশন কেটে যাবে ইনশা আল্লাহ । টেনশন থেকে মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ স. একটি দুআ পড়তেন। সেটির ওপরও আমল করা যেতে পারে। দুআটি হল, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়াল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবুনি, ওয়াদলাইদ দাইনি ও ওয়াগালাবাতির রিজাল' অর্থা হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট মানসিক অস্থিরতা , চিন্তা , অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপনতা, অধিক ঋণ ও মানুষের প্রাধান্য থেকে পানাহ চাই। সহীহ বুখারী : ২৮৯৬।

মাসউদুর রহমান, ঢাকা

প্রশ্ন -২: হারাম উপার্জনের টাকা দিয়ে খাবার খেলে তা কি হারাম হবে? হারাম খেলে ইবাদাত বন্দেগ ীকবুল হবে কি? হারাম সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো ।

উত্তর : হালাল উপার্জনের ওপর নির্ভর করা এবং হারাম উপার্জন বর্জন করা মুসলিমের জন্য অন্যতম ফরয ইবাদাত। বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় অনেক মুসলিম এ বিষয়ে কঠিন বিভ্রান্তিতে নিপতিত। মহান আলাহপবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর' [সূরা মুমিনূন আয়াত : ৫১]। এ আয়াত অনুযায়ী স কর্ম করার পূর্বশর্ত হলো হালাল বস্তু আহার করা। হাদীস থেকে জানা যায়, হারাম ভনকারীর দুআ কবুল করা হয় না। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি হারামখেয়ে থাকে তবে সে অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করবে। তবে তাকে ঘৃণা করা বা তার কোনো ইবাদতই কবুল

হবে না নিশ্চিতরূপে এরূপ বলাও ঠিক নয়। নবী-রাসূলগণ ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই যিনি কোনোদিন কোনো দোষই করেননি। আবার এরকম লোকও নেই যিনি একটুও ভালো কাজ করেননি। যিনি ভালো কাজই বেশি করেছেন আর মন্দ কাজ খুবই কম করেছেন এরকম লোককে ভালো মানুষ বলে গণ্য করা হয়। যাকে আমরা খারাপ মানুষ বলে জানি তিনিও কোনো না কোনো ভালো কাজ করেন। খারাপ মানুষ বলে কি তার ভালো কাজের সাওয়াব থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন? অবশ্যই না। আর একজন ভালো মানুষ যদি একটি অন্যায় কাজ করে ফেলেন তাহলেও তার অন্য সকল ভালো কাজের ভালো ফলাফল থেকে বঞ্চিত হবেন ইসলামে এ ধরনের কোনো বিধান নেই। সুতরাং যদি কেউ মন্দ কাজ করে বা হারাম খেয়ে মন থেকে অনুতপ্ত হন এবং ক্ষমা চান তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আবু মূসা, পাবনা

প্রশ্ন -৩ : আমি শুনেছি সন্তান প্রসবের পর সে নারী ৪০ দিন পর্যন্ত নামায, রোযা , সহবাস ইত্যাদি করতে পারবে না। এ বিষয়ে জানতে চাই।

উত্তর : আপনি যেটা শুনেছেন তা হলো , সন্তান প্রসবের পর নারীর অসুস্থ থাকার সর্বোচ্চ মেয়াদ যা ৪০ দিন। অর্থা এ মেয়াদের মধ্যে সে সুস্থ না হলে তাকে ঋতুবতী ধরা হবে। কোনো নারী যদি ৪০ দিনেও সুস্থ না হয় তাহলে সে ৪১ তম দিন থেকেই সালাত, সিয়াম, তাওয়াফ ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদাত করতে পারবে। আর কেউ যদি এর আগেই সুস্থ হয়ে যায় অর্থা ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেদিন থেকেই সে পবিত্রতা অর্জন করে সহবাসসহ যাবতীয় ইবাদাতগুলো করতে পারবে। ৪০ দিন পর্যন্ত প্রসবকারী নারী ইবাদাত ও সহবাস করতে পারবে না বলে যে বিষয়টি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে সেটি অজ্ঞতার কারণে লোকেরা বলে থাকে।

রাশেদ, চট্টগ্রাম

প্রশ্ন -৪: কিভাবে দুআ করলে দুআ কবুল হয়? জানালে কৃতজ্ঞ হবো ।

উত্তর : দুআ কবুলের যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো ফুলফিল করলে দুআ কবুল হবে ইনশা আল্লাহ । যেমন, হালাল ভণ ও হারাম বর্জন , সদা-সর্বদা দুআ করা, বেশি করে চাওয়া, ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া, মনোযোগ ও কবুলের দৃঢ় আশা নিয়ে দুআ করা, আল্লাহর হামদ ও নবীর ওপর দরূদের মাধ্যমে দুআ শুরু করা এবং দুআ শেষেও দরূদ পড়া, কিবলামুখী হয়ে দুআ করা, দুআ কবুল

হওয়ার সময়গুলোতে দুআ করা। যেমন রাতে বিশেষ করে রাতের শেষ ভাগে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, সাজদারত অবস্থায় , জিহাদের ময়দানে।

রেশমা, গাজীপুর

প্রশ্ন -৫: রমাযান মাসে অসুস্থতার কারণে আমি কয়েকটি রোযা রাখতে পারিনি। আমি কি ভাংতি রোযা আগে রাখবো নাকি শাওয়ালের ছয় রোযা আগে রাখবো ।

উত্তর : শাওয়ালের ছয় রোযা রাখার নিয়ম হলো আগে ভাংতি রোযাগুলো সম্পন্ন করে পরে ছয় রোযা রাখা। কারণ, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখলো , তারপর শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি রোযা রাখলো সে যেন এক বছর রোযা রাখল। সহীহ মুসলিম : ১১৬৪। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. রমাযানের রোযা পরিপূর্ণ করার পর ছয় রোযা রাখার কথা বলেছেন।

কামরুন নাহার, ঢাকা

প্রশ্ন -৬: স্বামী -স্ত্রী একে অন্যের নিন্দা করলে তা গীবত হবে কি না? যদি তারা একে অপরকে অন্যের অনিষ্টতা থেকে হেফাযত থাকার জন্য এরূপ করে তাহলেও কি তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে? জানালে খুশি হবো ।

উত্তর : স্বামী -স্ত্রী একে অপরকে কারো অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যদি অন্য কারো দোষ বর্ণনা করতে বাধ্য হয় তাহলে সেটি গীবতের পর্যায়ে পড়বে না। কারণ এতে পারিবারিক কল্যাণ নিহিত। সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণের জন্য সমাজের লোক বা পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার নিমিত্তে খারাপ লোকদের গীবত করা শরীয়তে বৈধ রয়েছে। কিন্তু এ ধরণের কোনো স্বার্থ ছাড়া কাউকে ছোট বা হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে কারো নিন্দা করা হলে অবশ্যই তা গীবত হবে।

প্রশ্ন -৭ : আমি একবার নিয়ত করেছিলাম যে, একটি ছাগল কুরবানী করব। কিন্তু আমি সেটা দিতে পারিনি, আমার কি গুনাহ হবে?

উত্তর : যখন কোনো মানত করা হয় তখন সেটা পালন করতে হয়। কিন্তু আপনি যেহেতু শুধু নিয়ত করেছিলেন, তাই তা মানত নয়। ছাগল কুরবানী দেয়া আপনার জন্য জরুরী নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মিরপুর

প্রশ্ন -৮: আমার মা বয়স্ক মানুষ। তিনি সারাদিন বিভিন্ন চ্যানেলে নাটক দেখেন। আমি তাকে নিষেধ করি কিন্তু তিনি তা শুনছেন না। আমার কি আরও কিছু করার আছে?

উত্তর : আপনার মা সারাদিন নাটক দেখেন, এটা খুবই দুঃখজনক বিষয়। আমরা দুআ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাকে সহীহ বুঝ দান করেন। আপনার দায়িত্ব হলো , তাকে বুঝানো ও নিষেধ করা। এতে যদি তিনি তা থেকে বিরত থাকেন তাহলে আল-হামদুলিল্লাহ । অন্যথায় তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করা যাবে না।

আনজুমান আরা বেগম, উত্তরা , ঢাকা

প্রশ্ন -৯: সালাতুস তাসবীহ পড়া যাবে কি? শরীয়তে এর পে কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : সালাতুস তাসবীহ সম্পর্কে সুনান আবূ দাউদে হাদীস রয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ স. তাঁর চাচা আব্বাস রা.কে জীবনে অন্তত একবার হলেও এ সালাত আদায়ের উপদেশ দেন এবং বলেন, এর দ্বারা তার পূর্বা -পর, ছোট -বড়, প্রকাশ্য -অপ্রকাশ্য , নতুন-পুরাতন ও স্বেচ্ছায় -অনিচ্ছায় কৃত সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। হাদীস নম্বর : ১২৯৭। তবে হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে আলিমগণের মাঝে দু'ধরনের মত রয়েছে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। আবার ইমাম নববী ও নাসিরুদ্দীন আলবানীসহ জুমহুর (অধিকাংশ) আলিমগণ এ হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করে এ সালাতকে মুস্তাহাব বলেছেন। কাজেই এ সালাত আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্ন -১০: সালাতুস তাসবীহ আদায়ের নিয়ম কি?

উত্তর : চার রাকাত সালাত আদায়ের নিয়তে তাকবীর বলে সালাত শুরু করে স্বাভাবিক সালাতের ন্যায় ছানা, সূরা ফাতিহা তারপর যে কোনো একটি সূরা মিলানোর পর ১৫ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'- এ তাসবীটি পড়া। তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পড়ার পর এ দুআটি ১০ বার, রুকু থেকে উঠে তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, সাজদায় গিয়ে সাজাদার তাসবীহ পড়ার পর ১০ বার, দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে ১০ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগে ১০ বার পাঠ করা। এভাবে প্রতি রাকাতে ৭৫ বার করে চার রাকাতে মোট ৩০০ বার এ তাসবীহটি পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

উম্মু শায়মা, মিরপুর, ঢাকা

প্রশ্ন -১১: আমার ছেলের ভালরেজাল্টের খবর শুনে আমি শুকরানা সালাত নিয়ত করেছি। আমি কি আগে ফরয সালাত আদায় করবো নাকি আগে শুকরানা সালাতটি পড়বো ?

উত্তর : ইসলামি শরীয়তে শুকরানা সালাত বলতে কিছু নেই। আনন্দের সংবাদ শুনে সালাত আদায় করার পক্ষে কুরআন ও হাদীসে কোনো প্রমাণ নেই। বরং হাদীসে যেটা রয়েছে তা হলে শুকরানা সাজদা করা। আনন্দের সংবাদ শুনে আল্লাহর দরবারে সাজদায় অবনত হওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। রাসূলুল্লাহ স. আনন্দের সংবাদ পেয়ে এভাবে সাজদায় অবনত হয়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট যখন মুসায়লামাতুল কাযযাবের হত্যার সংবাদ আসে তখন তিনি শুকরানা সাজদা আদায় করেন। চতুর্থ খলীফা আলী রা. খারেজীদের হত্যার সংবাদ পেয়ে একই রকম শুকরানা সাজদা আদায় করেন।

মোসাম্মাত নাহার, ঢাকা

প্রশ্ন -১২. আমি শুনেছি, বান্দাহ কোনো পাপ করলে তা সাথে সাথেই লেখা হয় না। বরং বিশেষ এক সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া হয় তাওবা করার জন্য । আমার প্রশ্ন হলো , আমি যা শুনেছি তা কি সঠিক? যদি সঠিক হয়, তাহলে অবকাশ দেয়ার সময়টি কতটুকু? এর পক্ষে কোনো দলীল থাকলে জানালে কৃতজ্ঞ হবো ।

উত্তর : আপনি যা শুনেছেন তা সঠিক। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কি পরিমাণ উদার ও দয়াবান, এটি তার ছোট একটি দৃষ্টান্ত । বান্দাহ ভালো কাজ করার নিয়ত করলেই সাথে সাথে তার নামে একটি নেকী লেখা হয় আর কাজটি করলে কাজের জন্য আলাদা সাওয়াব লেখা হয়। পান্তরে বান্দাহ কোনো অন্যায় করলে তাকে ৬ ঘন্টার অবকাশ দেয়া হয়। এর মধ্যে যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা বা তাওবা করে তাহলে সেটি ক্ষমা করে দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ । রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে মুসলিম বান্দাহ ভুল বা অন্যায় করে তাকে বাম পার্শ্বের ফিরিশতা ৬ ঘন্টা অবকাশ দেয়। এর মধ্যে সে যদি লজ্জিত হয় এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তাহলে সে তা আর লেখে না। আর ক্ষমা না চাইলে তার জন্য একটি গুনাহ লেখা হয়। তাবারানী : ৭৭৬৫। হাদীসটি সহীহ।

ডাঃ তরীকুল ইসলাম, মগবাজার, ঢাকা

প্রশ্ন -১৩: আমাদের দেশে মশা মারার জন্য এক ধরনের বেট পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন দোকানে মাছি বা মশা নিধনের জন্য ওভেনের ন্যায় ইলেকট্রিক এক প্রকারের যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়। এগুলোতে মশা বা মাছি পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয় এবং তা থেকে গন্ধ বের হয়। আমার প্রশ্ন হলো , এটা কি শরীয়তসম্মত ?

উত্তর : খুব বেশি প্রয়োজন না হলে এ ধরনের যন্ত্র ব্যবহার না করাই উত্তম । তবে মশা বা মাছির উপদ্রব বেড়ে গেলে প্রয়োজনে এ যন্ত্রদ্বয় ব্যবহার করা জায়েয। এগুলোতে মশা বা মাছি পড়ে পুরে যায় এ ধারণাটি সঠিক নয়। বরং এতে তা বিদ্যুত শক্ড-এর মাধ্যমে মারা যায়। তাছাড়া যে হাদীসে প্রাণী পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করা হয়েছে তা শাস্তির উদ্দেশ্যে হলে নিষিদ্ধ । শাস্তির উদ্দেশ্যে না হয়ে অন্য কোনো কারণে হলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

এনামুল হাসান, ঢাকা

প্রশ্ন -১৪: আমি বিদেশ থেকে আমার টাকা দিয়ে বাবাকে হজ্জে পাঠালে আমার নামে বদলী হজ্জ করতে পারবে কি?

উত্তর : যিনি বদলী হজ্জ করবেন তার জন্য শর্ত হলো , তাকে নিজের হজ্জ আগে করতে হবে। আপনার বাবা নিজের হজ্জ করেছেন কি না এ বিষয়ে আপনি কিছুই বলেননি। তিনি যদি ইতোপ ূর্বে নিজের হজ্জ করে থাকেন তাহলে তিনি আপনার বদলী হজ্জ করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ স. এক লোককে ‘লাব্বাইক আন শুবরুমাতা' অর্থা শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ তালবিয়া পাঠ করতে শুনে বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছো ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, আগে নিজের হজ্জ করো । তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে। সুনান আবু দাউদ : ১১১৮। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, বদলী হজ্জ আদায়কারীর জন্য আগে নিজের হজ্জ আদায় করা জরুরী নয়। তবে নিজের হজ্জ করা আছে এমন লোককে দিয়ে করাতে পারলে ভাল।

মুহাম্মাদ আয়াতুল্লাহ রাযু

প্রশ্ন -১৫: কাউকে যদি খুন করা হয় তাহলে কি তার আত্মা কষ্টে থাকে, দুনিয়াতে ঘুরতে থাকে বা কি অবস্থায় থাকে? একটু বিস্তারিত জানাবেন। একেকজন একেক রকম কথা বলে, তাই সঠিকটা জেনে তার ওপর আমল করতে চাই।

উত্তর : খুনের সাথে আত্মা শান্তিতে থাকা বা না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হন তাহলে শান্তিতেই থাকার কথা। আর যদি নেককার না হন তবে সেটি আল্লাহই

ভালো জানেন তিনি কি অবস্থায় থাকেন। মৃত্যুর পরের বিষয়গুলো আলমে বারযাখের সাথে সম্পৃক্ত । সেসব বিষয়ে জানতে চাওয়াটা ঈমানের পরিপন্থী । কাজেই সেসব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি না করাটাই ঈমানদার লোকের বৈশিষ্ট্য । ইসলামের দৃষ্টিভ ঙ্গি হলো , জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা -ভাবনা না করা, কারণ এটা শয়তানের একটা ওয়াসওয়াসা। এ ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাযত থাকার জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

ইশা খান, ঢাকা

প্রশ্ন -১৬. অনেকেই কাবা ঘর তথা বাইতুল্লাহ -এর অর্থ করেন যে, এটি আল্লাহর ঘর। কাবা ঘর যে আল্লাহর ঘর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কি কোনো প্রমাণ বা আয়াত রয়েছে?

উত্তর : জি হ্যা , পবিত্র কুরআনে কাবা ঘরকে আল্লাহর ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমরা যদি পবিত্র কুরআনের ১০৬ নং সূরার দিকে তাকাই তাহলেই আমরা এর প্রমাণ পেয়ে যাবে। সেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘ফালইয়া‘বুদূ রাব্বা হাযাল বাইত' অর্থা তারা ইবাদাত করুক এ গৃহের রব তথা মালিকের। এখানে আল্লাহ তাআলাকে কাবা ঘরের রব বা মালিক বলা হয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মহান আল্লাহ এ ঘরে বসবাস করেন। বরং তাঁর অবস্থান হলো আরশের ওপর যা পবিত্র কুরআনের অসংখ্যা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ।

প্রশ্ন -১৭: আমার ১০ বছরের বাচ্চার জন্যে বা তার নামে কুরবানী করতে পারব কি?

উত্তর : আপনার বাচ্চার পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কুরবানী দিতে হবে আল্লাহর নামে। আর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে তাকেই কুরবানী করতে হয়। আর অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী দিলে সেটি হবে নফল।

রেবেকা ইসলাম

প্রশ্ন -১৮: লটারীর টিকেট কি হারাম? যেমন ধরুন, গাড়ী বা বাড়ি বা পুরস্কার লাভের আশায় আমি লটারীর টিকেট কিনলাম। এটা কি বৈধ হবে? জানতে চাই।

উত্তর : জুয়া ইসলামে হারাম করা হয়েছে। লটারীর টিকেট এ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত । পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, “হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা -বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম । সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা

সফলকাম হও” [সূরা মায়িদা, আয়াত : ৯০]। তবে প্রাইজ ব-েরবিষয়টি এর আওতায় পড়বে না। কারণ, সেটির মূল্যমান অনুযায়ী যখন খুশি তখন তা টাকায় চেঞ্জ করা সম্ভব ।

সৈয়দ জিয়া উদ্দিন

প্রশ্ন -১৯: সালাত সম্পর্কে আমার কিছু জানার রয়েছে। জামাতে সালাত পরার ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথম রাকাত না পাই সেত্রে একা আদায় করার সময় কি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা মিলাতে হবে।

উত্তর : জি হ্যা , যার প্রথম রাকাত ছুটেছে অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাত ছুটেছে, তাকে এ রাকাতদ্বয় পড়ার সময় অবশ্যই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা কুরআনের একটি অংশ মিলাতে হবে।

প্রশ্ন -২০: আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব নাসিরুদ্দিন আলবানী রহ. সম্পর্ক েমন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তিনি নাকি শেষ বয়সে বিভ্রান্ত হয়ে পরেছিলেন। আপনার জানামতে এর সত্যতা কতটুকু? উত্তর জানালে কৃতার্থ থাকবো । আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

উত্তর : নাসিরুদ্দিন আলবানী রহ. শেষ বয়সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন- এমন কোনো কথা আমাদের জানা নেই, এটি অসত্য । বরং এমন কথা বলাটাই বিভ্রান্তিকর ।

প্রশ্ন -২১: ভাইবোন মিলে একই পরিবারে একসাথে থাকা-খাওয়া সত্ত্বেও এক গরুতে শরীক হয়ে একসাথে কুরবানি করা যাবে কি?

উত্তর : কুরবানি এমন একটি ওয়াজিব ইবাদাত যেটি অবশ্য করণীয়। অবশ্য কেউ কেউ কুরবানীকে সুন্নাতও বলেছেন। তাকেই কুরবানী দিতে হয় যিনি সম্পদের মালিক। একটা যৌথ পরিবারে যদি একজন ব্যক্তি রোজগার করেন এবং তিনিই সম্পদের মালিক থাকেন তাহলে ঐ পরিবারের কেবল ঐ ব্যক্তিরই কুরবানি দিতে হয়। পরিবারের অন্য সদস্যরা যারা তার উপর নির্ভরশীল তাদের আলাদা কুরবানি দিতে হয় না। এখানে শরীক হয়ে ভাগাভাগি করে কুরবানি দেয়ার কিছু নেই। আতা ইবন ইয়াসার বলেন, ‘আমি আবু আইয়ুব আনসারী রা. কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহর সময়ে কিভাবে কুরবানী দেয়া হতো ? তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী দিতো এবং তা থেকে নিজ েরাখেত ও অন্যদেরকে খাওয়াত” [সুনান তিরমিযী : ১৫০৫]।

আরিফ বিল্লাহ , মুহাম্মাদপুর , ঢাকা

প্রশ্ন -২২: হজ্ব করে আসার পরে নাকি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে শুধু আল্লাহ বিল্লাহ করতে হবে: কথাটি কতটুকু ইসলাম সম্মত ?

উত্তর : এ কথাটি ইসলাম সম্মত নয়। হজ্ব করে আসার পরেও বৈধ সকল কাজকর্ম করা যাবে। যেমন হালাল রুজী অন্বেষণ করা ফরয, এ কাজটি হজ্ব করার আগে-পরে সবসময় করা যাবে। এরকম ধারণা করা হয় যে, হজ্বের পরে হাটে-বাজারে যাওয়া নিষেধ, ধারণাটি মোটেই ইসলাম সম্মত নয়। হজ্বের পূর্বে যে সকল নাজায়েয কাজ নিষিদ্ধ ছিলো তেমনি হজ্ব করার পরেও সকল নাজায়েয কাজ নিষিদ্ধ এবং সকল জায়েয কাজ করার ব্যাপারেও কোনো নিষেধ নেই।

প্রশ্ন -২৩: মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী দিলে তা কুরবানী দাতা খেতে পারবেন কি? না কি সবটাই গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে? কুরবানীর গোশত বন্টনের বিশুদ্ধ নিয়ম কী?

উত্তর : মৃত বা জীবিত ব্যক্তি যে কারো পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া হলে তার গোশত সবাই খেতে পারবে। সবটাই গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে না। কুরবানীর গোশতের বন্টনের বিশুদ্ধ নিয়ম হলো , পুরো গোশতকে তিনভাগ করে একভাগ নিজেদের জন্য রাখা, বাকী দু'ভাগের একভাগ আত্মীয়দের এবং একভাগ গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন -২৪: কুরবানী করার সময় সকল আত্মীয় -স্বজনের নাম দিয়ে যদি আমার নাম না দেয়া হয় এতে কি কুরবানী হবে?

উত্তর : সঠিক নিয়ম হলো কুরবানী যার উপরে ওয়াজিব তার পক্ষ থেকেই কুরবানী দিতে হবে। অতএব কুরবানী যেহেতু আপনি দিচ্ছেন তাই প্রথমে আপনার পক্ষ থেকে এবং তারপর আত্মীয় -স্বজনে র পক্ষ থেকে নিয়্যাত করা। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কুরবানীর পশু জবাই করার সময় দু‘আ পড়ার পর বলেছিলেন, “আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা ওয়া আন মুহাম্মাদিন ও উম্মাতিহি , বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার” অর্থা হে আল্লাহ , আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনারই উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে, ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করলেন [সুনান আবূ দাউদ : ২৭৯৭]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে এবং পরে উম্মাতের পক্ষ থেকে

কবুল করার জন্য দু'আ করেছিলেন। কাজেই মুস্তাহাব হলো , প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে পরে অন্যান্যদের পক্ষ থেকে নিয়্যাত করা।

প্রশ্ন -২৫: কুরবানীর পশু জবেহ করার বিনিময়ে টাকা নেয়া শরীয়তে জায়েয আছে কিনা?
উত্তর : কুরবানীদাতার নিজ হাতে জবেহ করাই উত্তম । অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে দিয়ে জবেহ করানো এবং বিনিময় দেয়া জায়েয আছে। তবে কুরবানীর গোশত বা চামড়া বিনিময় হিসেবে দেয়া যাবে না। বিনিময় দেয়া যেহেতু জায়েয, সঙ্গত কারণেই নেয়াও নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমরা হাদিয়া দাও তাহলে পরস্পর মহব্বত বাড়বে' [আলআদাবুল মুফরাদ : ৫৪৯]। তবে কেউ স্বেচ্ছায় সেবার ভিত্তিতে করলে তা খুবই ভালো কাজ হবে।

প্রশ্ন -২৬: কুরবানীর পশু যিনি জবাই করবেন তাকে কি জবাই করার প্রাক্কালে কুরবানী দাতার নাম এবং তার পিতার নাম জোরে জোরে শব্দ করে পড়তে হবে?
উত্তর : যদিও আমাদের দেশে এই নিয়মটি চালু আছে তবে ইসলামে এ ধরনের কোনো বাধ্যবা ধকতা নেই। আসলে কুরবানী দাতার নাম এবং পিতার নাম শব্দ করে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। কার পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তা তো আলিমুল গাইব মহান আল্লাহ জানেনই। সুতরাং এটি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

প্রশ্ন -২৭: "কুরবানীতে গোশত খাওয়ার নিয়ম আড়াই দিন" কথাটি কি ঠিক? সৌদি আরব থেকে কুরবানীর যে গোশত বাংলাদেশে আসে সেটা খাওয়া কি হালাল?
উত্তর : জ্বি না। কুরবানীর গোশত খাওয়ার নিয়ম আড়াই দিন কথাটি মোটেই ঠিক নয়। কুরবানীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট দিন বা সময় নির্ধারিত নেই। তবে ইসলামের সূচনালগ্নে তিনদিনের পর কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। জাবির রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. তিনদিনের পর কুরবানীর গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন। আবার পরবর্তী বছর সময় তিনি বলেছেন যে, এখন তোমরা খেতে পার, সফরের পাথেয় হিসেবে কাজে লাগাতে পার এবং জমা করেও রাখতে পার [সহীহ মুসলিম]। মূলত প্রথমে বেদুঈনদের দুরাবস্থার কারণে নিষেধাজ্ঞাটি ছিল। পরবর্তীতে তা না থাকায় নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়। কাজেই কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তা খাওয়া যাবে। শরীয়তে

এ ব্যাপারে কোনো বাধা নিষেধ নেই। আর সৌদি আরব থেকে যে সকল কুরবানীর গোশত বাংলাদেশে আসে সেটা সম্পূর্ণ হালাল। এটি হারাম হবার কোনো কারণই নেই।

নাদিয়া, মোহাম্মাদপুর , ঢাকা

প্রশ্ন -২৮: ঈদুল ফিতরের ক'দিন পর কুরবানীর ঈদ হয়?

উত্তর : আরবী মাস হিসেবে ঈদুল ফিতরের ২ মাস ৯ দিন পর ১০ম দিনে ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ হয়ে থাকে।

মুহাম্মাদ মনিরুল মান্নান

প্রশ্ন -২৯: আমার স্ত্রী আমার সাথে বিভিন্নভাবে মিথ্যা কথা বলে। এক পর্যায়ে সে আমার সাথে কুরআন শরীফ ধরে ওয়াদা করে যে, আমার সাথে সে আর কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। কিন্তু এরপরও সে আমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে। যার ফলে আমি তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি; যদিও সে আমার কাছে আরেকবার সুযোগ চেয়েছিল। এখন আমার প্রশ্ন হলো , ক. সে আমার সাথে কুরআন ধরে ওয়াদা করার পরও তা ভঙ্গ করেছে, এতে কি তার গুনাহ হবে না? খ. আমার কি তাকে আরেকবার সুযোগ দেয়া উচি ছিল না? এবং গ. আমি কি তাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবো হিল্লা বিয়ে ছাড়া?

উত্তর : মিথ্যা কথা বলা বড় ধরনের পাপ। আর কেউ যদি কুরআন ধরে মিথ্যা না বলার শপথ করার পর মিথ্যা কথা বলে থাকে তাহলে সেটি আরও জঘন্য অপরাধ। আপনার স্ত্রী সত্যিই যদি মিথ্যা বলে থাকেন তাহলে তিনি জঘন্য অপরাধ করেছেন। কিন্তু তার এ অপরাধের জন্য আপনি যে তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন সেটাও ঠিক করেননি। ইসলামে তালাক বৈধ ঠিকই, কিন্তু ছোট -খাটো কারণে তালাক দেয়াকে ইসলাম পছন্দ করে না। তালাকের বিধান রাখা হয়েছে যার তালাক ছাড়া কোনো উপায়ন্তর নেই তার জন্য। আমরা যেভাবে ছোট -খাটো কারণে তালাক দিয়ে থাকি তা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আপনার উচিত ছিল তাকে আরও বেশ কয়েকবার সুযোগ দেয়া এবং তাকে বুঝানো । এখন তাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আপনি আপনার এলাকার কোনো বড় মাদরাসার ফাতওয়া বিভাগ থেকে লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে লিখিত সমাধান চাইতে পারেন। তালাকের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে হলে সে বিষয়ে বিস্তারিত ও লিখিত বক্তব্য লাগবে।

প্রশ্ন -৩০: আমার স্ব ামীবদলী হজ্জ করতে যাবেন। কিন্তু তিনি লোকদের কাছে বলার সময় বদলী হজ্জে যাবেন এ কথা না বলে হজ্জে যাবেন বলে থাকে। তিনি এরূপ বলার কারণে কি গুনাহগার হচ্ছেন ?

উত্তর : না, এরূপ বলার কারণে তিনি গুনাহগার হচ্ছেন না।

কাজী নাসির উদ্দিন , উত্তরা , ঢাকা

প্রশ্ন -৩১: মৃত ব্য ক্তিদের জন্য কুরবানী করা যায় কি? আমি কি কুরবানীর ক্ষেত্রে জীবিতদের পাশাপাশি মৃত আত্মীয়দের পক্ষ থেকেও কুরবানী করতে পারবো ?

উত্তর : কুরবানী হচ্ছে ওয়াজিব ইবাদাত। জীবিত ব্যক্তি তাঁর সামর্থ অনুযায়ী কুরবানী করবেন এটাই নিয়ম। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করাকে ইসলামে তেমন কোনো উ সাহ দেয়া না হলেও মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে জীবিত ও মৃত উম্মাতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলেন যা দ্বারা মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী জায়েয বলে প্রতীয়মান হয় [সহীহ মুসলিম : ৩৬৩৭]। আপনি একই পশু জীবিতদের পাশাপাশি মৃতদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে পারবেন।

প্রশ্ন -৩২. কুরবানীর গরুতে আকীকা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : আক্বীকা এবং কুরবানী স্বতন্ত্র দু'টি ইবাদাত একসাথে করার কোনো বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছিলো বলে জানা যায়নি রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণ বকরী, দুম্বা , মেষ ও এ জাতীয় পশু দ্বারা আকীকা দিতেন। গরু, উট বা এ জাতীয় পশু দ্বারা আকীকা দেয়া তারা অপছন্দ করতেন। আয়িশা রা.-এর ভাতিজার জন্মের পর একজন তাঁকে উট আকীকা দিতে পরামর্শ দেন। তখন তিনি বলেন, “নাঊযু বিল্লাহ ! তা করবো কেন; বরং রাসূলুল্লাহ স. যা বলেছেন তাই করবো : দুটি সমান মেষ” [ইরওয়াউল গালীল : ২৫১, হাদীসটি সহীহ]। তাই আমাদের এই প্রবণতা মোটেও ঠিক নয়। আক্বীকা শিশুর জন্মের ৭ দিনের মাথায় করতে হয়। অতএব কুরবানীর জন্য বসে থাকা আক্বীকার জন্য ঠিক নয়। আক্বীকার জন্য একটি ছাগল বা দু'টি ছাগলবা দুম্বা দেয়া হয়। অতএব আক্বীকার জন্য গরুর চিন্তা বা এর ভাগের চিন্তা করা মোটেই উচিত নয়। ছেলের জন্য দুটি ও মেয়ের পক্ষে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা যে কোনোটি দিতে হয়।

প্রশ্ন -৩৩: হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি সহজভাবে জানা যায় এমন কোনো বই এর নাম বললে উপকৃত হবো ।

উত্তর : যারা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে গমন করেন তাদেরকে সৌদী সরকার এর পক্ষ থেকে একটি বই বিনামূল্যে দেয়া হয়। যেটি পড়ে অত্যন্ত সহজভাবে হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়। বইটির নাম হজ্জ ও ওমরা। হুজ্জাজ চেরিট্যাবল সোসাইটি প্রকাশিত 'হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড' নামে একটি গাইড পাওয়া যায়। সেটিও সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও সহীহ হাদিসের গ্রন্থসমূহ থেকে বা রিয়াদুস সালেহীন নামক হাদীস গ্রন্থ থেকে আপনি হজ্জ ও ওমরার নিয়মাবলী অবগত হতে পারেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৩৪: আমি হজ্জে যাবার নিয়ত করেছি, আমার ছোট দু'টি বাচ্চা রয়েছে। তাদেরকে নিয়ে হজ্জে যেতে পারবো কি? তাদের হজ্জ কি আদায় হবে?

উত্তর : জ্বি হ্যাঁ। আপনি আপনার ছোট বাচ্চাদের নিয়ে হজ্জে যেতে পারবেন এতে কোনো নিষেধ নেই। ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, "নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা' নামক স্থানে একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন কাওম? তারা বলল, মুসলিম সপ্রদায় । তারা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?' তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল। তখন এক মহিলা একটি শিশুকে উঠিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, এ শিশুটির হজ্জ কি হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ , এবং তোমার জন্য এর সাওয়াব রয়েছে" [সহীহ মুসলিম : ৩৩১৭]।

প্রশ্ন -৩৫ : যার পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া হবে তার জন্য নাকি যিলহাজ্জ মাসের ১ তারিখ থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত শরীরের অতিরিক্ত পশম, নখ, মুছ ইত্যাদি কর্তন করা নিষেধ? জানালে কৃতজ্ঞ হবো ।

উত্তর : হ্যাঁ , এ ধরনের একটি মত রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিমদের মতে যিনি কুরবানী করবেন তার জন্য যিলহাজের ১ তারিখ থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত নখ, মুছ, অতিরিক্ত পশম ইত্যাদি কর্তন করা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৩৬ : আমরা যারা ভাগে কুরবানী দেই। তাদের মধ্যে কারো টাকা যদি অবৈধ হয় তাহলে আমাদের কুরবানীও কি বাতিল হয়ে যাবে?

উত্তর : প্রথমতঃ কথা হলো যারা ভাগিদারদের টাকার মধ্যে অবৈধ টাকা থাকতে পারে এ ধরনের ধারণা করা ঠিক নয়। আপনাকে সর্বদা ইতিবাচক ধারণা করতে হবে। একজন মু'মিনের স্বভাব হওয়া উচিত, তিনি তার অপর ভাইয়ের প্রতি ইতিবাচক ধারণা করবেন। কারো প্রতি নেতিবাচক ধারণা করা ইসলাম সমর্থন করেনা। সূরা ৪৯ হুজুরাত, আয়াত : ১২। এমনও হতে পারে তিনি তার বৈধ উপার্জনের টাকাটিই এখানে দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার অবৈধ অর্থ দিয়ে কুরবানীতে শরীক হয়েও থাকে তাহলে তাতে অন্যদের কুরবানী বাতিল হবে কেন? অন্যরাতো কোনো অন্যায় করেনি। যে অন্যায় করেছে কেবল তার কুরবানিই বাতিল হবে এবং সেই কেবল গুনাহগার হবে। মহান আল্লাহ বলেন, প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। সূরা ৬ আনআম, আয়াত : ১৬৪।

প্রশ্ন -৩৭: ইসলামের রুকন বলতে কি বুঝায়? ইসলামের রুকন কয়টি ও কি কি? ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য কি? জানালে কৃতজ্ঞ হবো ।

উত্তর : ইসলামের রুকন বলতে ইসলামের ভিত্তিগুলোকে বুঝানো হয় যেগুলোর ওপর ইসলাম নির্ভরশীল । পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হলে এ ভিত্তিগুলো থাকতে হবে। ইসলামের রুকন ৫টি। কালেমা, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্ব । ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই সাধারণতঃ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃর্কিত বিষয়কে ঈমান আর কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে ইসলাম বলা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন -৩৮: অবিবাহিত কোনো মেয়ের উপর হজ্ব ফরয হলে সে কি হজ্বে যেতে পারবে? কার সাথে যেতে হবে?

উত্তর : অবিবাহিত মেয়ে যার উপর হজ্ব ফরয তিনি হজ্বে যেতে পারবেন তবে অবশ্যই মাহরাম (শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদের সাথে পর্দা করা জরুরী নয় এমন ব্যক্তি) এর সাথে। অর্থা ইসলাম যাদের সাথে দেখা করা জায়েয করেছে তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে। যেমন আপন ভাই, বাবা, আপন চাচা, মামা প্রমুখ । যদি মাহরাম না পাওয়া যায় তাহলে আর্থিক সঙ্গ তি থাকা সত্ত্বেও তার উপর হজ্ব ফরয বলে গণ্য হবে না। মহিলাদের হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহের মাহরাম বা

স্বামী থাকা একটি অন্যতম শর্ত । আবূ হুরায়রা রাদি, থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ এবং বিচার দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে তার জন্য কোনো প্রকার মাহরাম ছাড়া একদিন একরাত পরিমাণ পথ সফর করা জায়িয নেই” [সহীহ বুখারী : ১০৮৮]।

প্রশ্ন -৩৯: আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে যে, হজ্ব করার পূর্বে নাকি আজমীর শরীফ জিয়ারত করতে হবে? কথাটি কি ইসলাম সম্মত ?

উত্তর : কথাটি মোটেই ইসলাম সম্মত নয়। বরং এটি ইসলামের বিপরীত কথা। এমন কথা ইসলামে কোথাও নেই। কথাটি যারা বলছেন তারা অজ্ঞতাবশতঃ বলেছেন।

প্রশ্ন -৪০: কোনো মুসলমানের জন্য কি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব মানা বাধ্যতামূলক ?

উত্তর : নীতিগতভাবে আমাদের এ ব্যাপারে দ্বিমত করবার কোনো অবকাশ নেই যে, আল কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামী বিধানের অনিবার্য উ স। চার মাযহাবের ইমামনগণ গবেষণা করে যে মতামত পেশ করেছেন তা যদি আল কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তা মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। যারা কুরআন এবং হাদীসের সরাসরি জ্ঞান অর্জনে অক্ষম তারা যে কোনো মাযহাব অনুসরণ করতে পারেন। মৌলি ক যে সকল বিষয় কুরআন এবং হাদীসে রয়েছে সেটাই সকলকে অনুসরণ করতে হবে। কুরআন এবং হাদীসের মৌলিক হুকুম-আহকাম না মানলে কুফরী করা হবে, ঈমান বিলুপ্ত বলে প্রমাণিত হবে। মাযহাবপন্থী হওয়া দোষের কিছু নয় তবে কট্টোরপন্থী হওয়া দোষের । আমি যার অনুসারী তিনি যা বলেছেন, সেটা কুরআন-হাদীসসঙ্গত হোক বা না হোক অন্ধভাবে তাই অনুসরণ করতে হবে এ ধরনের মনমানসিকতা দোষনীয় । অনুরূপ মাযহাবপন্থী হলেই আহলে হাদীসের অবজ্ঞা করা বা তারা সঠিক নয় এমনটি মনে করা যেমন ঠিক নয়, তেমনি আহলে হাদীস হলেই মাযহাবপন্থীরা শুদ্ধ নয় মনে করাও ঠিক নয়।

মুহাম্মাদ আনওয়ার হোসেন

প্রশ্ন -৪১ : আমার বাবা ইদানিং মারা গিয়েছেন। তার অনেক সম্পত্তি থাকা সত্বেও তিনি হজ্ব করেননি। এখন আমরা তিন ছেলে, আমাদের ওপর কি বাবার বদলী হজ্ব করানো দায়িত্ব ?

উত্তর : আপনার কথার ভিত্তিতে বুঝা যাচ্ছে আপনার বাবার ওপর হজ্ব ফরয ছিল। হজ্ব ফরয হলে তা অনতিবিলম্ব োদায় করা উচিত। আপনার পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের

মাঝে বন্টন করা না হয়ে থাকলে তার সম্পত্তি থেকে যিনি নিজের হজ্ব করেছেন এমন কোনো লোককে দিয়ে তার বদলী হজ্ব করিয়ে নিন। আর সম্পত্তি ভাগ হয়ে থাকলে মীরাস সূত্রে পাওয়া সেই সম্পত্তি থেকে সকলে মিলে কাউকে দিয়ে তার পক্ষ থেকে হাজ্জটি করিয়ে নিন।

আল আমিন শেখ, বাংলাট্রাক লিমিটেড, মহাখালী, ঢাকা

প্রশ্ন -৪২: একজন মা, বাচ্চা প্রসব করার পরে কত দিন পর্যন্ত তার স্তনে দুধ থাকে। বচ্চা প্রসব -এর তিন বছর পরে যদি কোনো মা, অন্যের সন্তানের মুখে স্তন দিয়ে বাচ্চাকে ঘুম পারায় তাহলে ঐ বাচ্চার সাথে এ মায়ের ছেলের বিয়ে কি বৈধ হবে? উল্লেখ থাকে যে, এ মা সঠিকভাবে বলতে পারছে না যে, তার স্তনে সে সময়ে দুধ ছিল কি ছিল না।

উত্তর : নারীর স্তনের দুধ থাকা না থাকার বিষয়টি সন্তানকে দুধ পান করানোর ওপর নির্ভর করে। সন্তানকে দুধ পান করানোর বিষয়টি যতদিন অব্যাহত থাকে ততদিন মায়ের স্তনে দুধ থাকে। এর পর ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। কোনো শিশু তার দুধ ভাই ও বোনের জন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো শিশুটি দুই বছর মতান্তরে আড়াই বছর বয়সের মধ্যে তা পান করতে হবে। দুই বা আড়াই বছর বয়স পার হওয়ার পর যদি কোনো শিশু কারো মায়ের দুধ পান করে তাহলে এর দ্বারা বিবাহ হারাম হবে না। আপনার প্রশ্নে দু'টি বিষয় অস্পষ্ট । যে বাচ্চাকে মুখে স্তন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে তার বয়স তখন কত ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। মায়ের স্তনে দুধ ছিল কিনা সেটিও নিশ্চিত বলতে পারছেন না। আশাকরি আমাদের দেয়া নীতির ভিত্তিতে আপনি সমাধানদ্বিবের করতে পারবেন।

শাহ আলম, জাপান

প্রশ্ন -৪৩: আলহাজ্ব এবং হাজি শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ ? এ শব্দদ্বয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : আলহাজ্ব এবং হাজি উভয়টি শুদ্ধ । হাজ্ব সম্পন্নকারী ব্যক্তিকেই আলহাজ্ব এবং হাজি বলা হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, যিনি একাধিকবার হাজ্ব করেন তিনি আলহাজ্ব আর যিনি একবার হজ্ব করেন তিনি হাজি। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

মুহাম্মাদ মনিরুল মান্নান

প্রশ্ন -৪৪: আমাদের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। কিন্তু আমরা দু'জনে এখনও অধ্যয়ন করছি বলে আমার স্ত্রীকে আমি ঘরে তোলে আনিনি। আমরা মাঝে মাঝে এক সাথে থাকি। অনেক সময় অল্পকিছু দিন এরূপ একসাথে থাকি। আবার কখনো ৩/৪ মাসে একবার আমরা একসাথে থাকি। এটা নির্ভর করে আমাদের দু'জনের সুযোগ -সুবিধার ওপর। আমার প্রশ্ন হলো , আমি শুনেছি স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে ৪০ দিন সহবাস না হলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? যদি বিয়ে ভেঙ্গে যায় তাহলে আমাদের এখন কি করণীয়?

উত্তর : আপনি যা শুনেছেন যে, স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে ৪০ দিন সহবাস না হলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়, তার কোনো ভিত্তি নেই। কুরআন ও হাদীসে এর পে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই।

রাশেদা বেগম বেবি, ঢাকা

প্রশ্ন -৪৫: বেতেরের সালাতে দুআয়ে কুনুত পড়তে ভুলে গেলে আমাদের কি করণীয়?

উত্তর : বেতরের সালাতে দুআয়ে কুনুতের বিধান নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। কেউ কেউ দুআয়ে কুনুত পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন। তাদের মতে ভুলে দুআয়ে কুনুত বাদ পড়লে সাহু সাজদাহ দিয়ে সালাত শেষ করলেই সালাত আদায় হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ এটাকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলেছেন। তাদের মত অনুযায়ী দুআয়ে কুনুত না পড়লেও সালাত আদায় হয়ে যাবে।

এই বিভাগে আপনিও প্রশ্ন পাঠাতে পারেন

প্রশ্ন পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা , বাড়ী নং-১৫, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর -৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০